بسم الله الرحمن الرحيم

গোড়ার কথা

ইসলাম চিরন্তন ও কালজয়ী দ্বীন। এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের আসল রূপ অবিকৃত ও অক্ষত রাখতে হলে তার প্রতি ভেজালের সকল অনুপ্রবেশ দ্বার বন্ধ করতে হবে। যেহেতু দ্বীন পরিপূর্ণ এক গ্লাস দুগ্ধের ন্যায়, যাতে এক বিন্দুও অন্য কিছু রাখার, সংযোজন ও পরিবর্ধন করার কোন অবকাশ নেই। 'ওঁর-এঁর' কথা ও অভিমতের পানি বা গোমূত্রকে তাতে স্থান দিতে গেলে অবশ্যই বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল কিছু দুধ গ্লাস হতে উপচে পড়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে ঐ দুগ্ধ পানের অযোগ্য হয়ে পড়বে। তাই দ্বীনে যাতে ভেজাল প্রবেশ না করে তার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ- উম্মতকে অতি গুরুত্বের সহিত তাকীদ করে গেছেন। তাঁর সাহাবা, তাবেয়ীন এবং সলফগণও ঐ ভেজাল মিশ্রণ থেকে মুসলিমদেরকে উচিত সতর্ক করে গেছেন। তাঁদের পর সেই ফরযই উলামাগণের উপর বর্তায়। ভেজালের প্রত্যেক ছিদ্র পথ বন্ধ করা, অনুপ্রবিষ্ট ভেজাল চিহ্নিত করে তা উৎখাত করা এবং ঐ নির্ভেজাল দুগ্ধকে কালো বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হতে চোরা ব্যবসায়ীদেরকে প্রতিহত করা তাঁদের এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মহান কর্তব্য।

এই কর্তব্য ভার অনুভব করে, সমাজের মানুষকে সাবধান করার লক্ষ্যে অধমের সাধ্যমত এই কিঞ্চিৎ প্রয়াস। এর দ্বারা সমাজে কিছু পরিমাণও জাগরণ এলে এবং সঠিক পথ স্পষ্ট হলে শ্রম সার্থক হবে। এতে যা কিছু প্রমাণ করতে চেয়েছি তা সঠিক হলে মহান আল্লাহর

তরফ হতে এবং ভুল হলে আমার ও শয়তানের তরফ হতে। প্রমাণসহ ক্রটি চিহ্নিত করে জ্ঞানীরা আমার সঠিক দিগদর্শন করলে কৃতজ্ঞ হব।

এই পুস্তিকাটি প্রস্তুত করতে বহু মূল্যবান গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। তন্মধ্যে আল-ই'তিসাম (শাত্বেবী), সহীহুল জামিইস সাগীর (মুহাদ্দেস আলবানী রঃ), আল-ইবদা' ফী মাযা-র্রিল ইবতিদা' (আলী মাহফুয), আল-বিদআতু যাওয়াবিতুহা অআষারুহাস সাইয়্যে ফিল উম্মাহ (ডাঃ আলী মুহাম্মাদ নাসের আল-ফাকীহী) এবং এবং তানবীহু উলিল আবসার ইলা কামালিদ্দীন অমা ফিল বিদআতি মিনাল আখত্বার (ডঃ সালেহ সা'দ আল-সুহাইমী) বিষেশভাবে উল্লেখযোগ্য। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে এবং আমাদেরকে নেক প্রতিদান দিন। আমীন।

সারা বিশ্বে কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভেজাল প্রচারে সউদিয়ার যুব-সমাজের নিঃস্বার্থ আগ্রহ ও প্রচেষ্টার সীমা নেই। এর পশ্চাতে তাঁরা কেবল মহান আল্লাহর নিকট বৃহৎ প্রতিদানই চান।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নগণ্যের পুস্তিকাটিকে মাজমাআর দাওআত অফিস কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করে সমাজকে উপহার দিতে আনন্দবোধ করেছেন। তাই তাঁদের জন্য আমাদের আন্তরিক নেক দুআ। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন ও অধিক ভাল কাজে আরো আরো তওফীক দিন এবং মুসলিম সমাজকে বিদআত ও শির্কের সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়ে কিতাব ও সুন্নাহর অনাবিল 'আবে হায়াত'-এ পরিপ্লুত করুন। আমীন।

বিনীত

আব্দুল হামীদ মাদানী

আল-মাজমাআহ

২২/৯/১৪১৫ হিঃ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

জানা আবশ্যক যে, দ্বীনে অনুপ্রবিষ্ট অভিনব কর্ম (বিদআত)সমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু ঐ বিদআত থেকে মুক্ত না হয়ে মুসলিমের জন্য মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব হয় না। এই মুক্তিলাভও ততক্ষণ সম্ভবপর নয় যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিদআত সম্বন্ধে পরিচিতি লাভ না হয়েছে, যদি তার নিয়মাবলী ও মৌলিক সূত্র না জানা থাকে তাহলে। নচেৎ অজান্তে বিদআতে আপতিত হওয়াই স্বাভাবিক। অতত্রব বিদআত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা ওয়াজের। কারণ যে জিনিষ ছাড়া কোন ওয়াজেব কোন ওয়াজেব পালন হয় না সে জিনিষও ওয়াজেব, যেমন ওসূলের উলামাগণ বলেন।

তদনুরূপই শির্ক ও তার বিভিন্ন প্রকারাদিকে জানা। কারণ যে শির্ক না চিনবে সে তাতে নিপতিত হবে। যেমন বহু সংখ্যক মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা। দেখা যায় তারা শির্ক দ্বারা মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। যেমন আউলিয়া ও সালেহীনদের নামে নযর মানা, শফথ করা, তাঁদের তওয়াফ করা, তার উপর মসজিদ নির্মাণ করা এবং সেখানে সিজদা করা প্রভৃতি কর্ম যার শির্ক হওয়ার কথা আহলে ইলমের নিকট অবিদিত নয়। এই জন্যই ইবাদত করায় কেবল সুন্নাহ জানার উপর সংক্ষেপ করা যথেষ্ট নয় বরং সাথে তার পরিপন্থী বিদআতকে চেনাও জরুরী। যেমন ঈমানের জন্য কেবল তওহীদ জানাই যথেষ্ট নয় বরং তার সাথে তার পরিপন্থী শির্ককে চেনাও একান্ত দরকার। এই তথ্যের প্রতিই কুরআন মাজীদে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ ﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতীর মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি (এই নির্দেশ দিয়ে) যে, তোমরা আমারই এবাদত কর এবং তাগূত (পূজ্যমান গায়রুল্লাহ) থেকে দূরে থাক। *(সূরা নাহল ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ ﴾

অর্থাৎ, যারা তাগূতের ইবাদত করা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। *(সূরা যুমার ১৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, নিশ্চয় সে এমন শক্ত হাতল ধারণ করবে যা কখনো ভাঙ্গার নয়।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৬)*

আর এ তথ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ স্পষ্ট করে তুলে ধরে বলেন, "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই) বলল (স্বীকার করল) এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য পূজিত বাতিল মাবূদসমূহকে অস্বীকার করল, তার মাল ও জান হারাম হয়ে গেল। (অর্থাৎ, সে মুসলিম বলে গণ্য হয়ে গেল)। আর তার (বাকী) হিসাব আল্লাহর উপর।" *(মুসলিম)*

সুতরাং তিনি কেবল আল্লাহর তওহীদ স্বীকার করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি বরং তার সহিত আল্লাহ ছাড়া অন্য সব পূজ্যমান ব্যক্তি-বস্তুকে অস্বীকার ও বর্জন করাকে একই সূত্রে শামিল করেছেন। অতএব এ তথ্য ও এই নির্দেশ) স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে, ঈমান আনার সাথে সাথে কুফরীকে চেনা জরুরী, নতুবা অজান্তে কখন মুমিন কুফরীতে আপতিত হয়ে যাবে সে তার কোন টেরই পাবে না।

অনুরূপভাবে সুন্নাহ ও বিদআতের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ; উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ, ইসলাম দুই বৃহৎ বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রথমতঃ আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না এবং দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ যা বিধিবদ্ধ করেছেন সে শরীয়ত ছাড়া আর ভিন্ন কোন নিয়ম-পদ্ধতিতে বা নির্দেশে তাঁর ইবাদত করব না। অতএব যে ব্যক্তি এই দুই বুনিয়াদের মধ্যে কোন একটিকে উপেক্ষা করে সে অপরটিকেও বর্জন করে এবং সে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে না। যেহেতু প্রথম ভিত্তি ত্যাগ করলে মুশরিক এবং দ্বিতীয়টি ত্যাগ করলে বিদআতী হয়ে যাবে।

অতএব পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হল যে, বিদআত চেনা অবশ্যই জরুরী। যাতে মুমিনের ইবাদত তা থেকে মুক্ত ও নির্মল হয়ে আল্লাহর

নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।

পক্ষান্তরে বিদআত সেই অনিষ্টকর বস্তুসমূহের অন্যতম যাকে চেনা ওয়াজেব, তা ত্যাগ করার জন্য নয়, বরং তা থেকে বাঁচার জন্য। যেমন আরবী কবি বলেন ঃ

'মন্দ জেনেছি বাঁচার লাগি নহে মন্দের তরে,
ভালো কি মন্দ চিনে না যে সে মন্দেতে গিয়ে পড়ে।'

অবশ্য এর মর্মার্থ হাদীস শরীফ হতে গৃহীত। সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ বলেন, "লোকেরা রসূল ﷺ-কে ইষ্টকর ও মঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত আর আমি কবলিত হবার আশংকায় তাঁকে অনিষ্টকর ও অমঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

আর এজন্যই যে সমস্ত বিদআত দ্বীনে অনুপ্রবেশ করেছে তার উপর মুসলিম জাতিকে সতর্ক ও অবহিত করা নিতান্ত জরুরী এবং বিষয়টি এত গুরুত্বহীন নয় যে, কেবল তাদেরকে তাওহীদ ও সুন্নাহ সম্পর্কিত জ্ঞান ও নির্দেশ প্রদান করাই যথেষ্ট এবং শির্ক ও বিদআত প্রসঙ্গে কোন কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নেই; বরং এ বিষয়ে চুপ থাকাই ভালো! যেমন, অনেকে এ ধরনের ধ্যান-ধারণা রেখে থাকে। অথচ এটা এক সংকীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গির ফল। যা শির্কের পরিপন্থী তওহীদ এবং বিদআতের পরিপন্থী সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান স্বল্পতার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর একই সময়ে এই দৃষ্টি-ভঙ্গি ঐ ধরনের মানুষদের অজ্ঞতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, তারা জানে না যে বিদআতে যে কেউ আপতিত হতে পারে, এমনকি আলেম মানুষও। কেননা, বিদআত করা বা তাতে আপতিত হওয়ার বহু কারণ আছে। যার মধ্যে যয়ীফ ও মওযু (জাল) হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমল করাও অন্যতম। যেহেতু কখনো কিছু উলামার নিকটেও তার কিছু অপ্রকাশ থেকে যেতে পারে। যাকে তাঁরা সহীহ হাদীস মনে করে তার উপর আমল করে থাকেন এবং আল্লাহর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভের আশা করেন। অতঃপর তাঁদের ছাত্ররা ঐ বিষয়ে তাঁদের অনুকরণ করে এবং ধীরে ধীরে জনসাধারণও তাঁদের দেখে নিঃসন্দেহে আমল করতে লাগে। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই তা পালনীয় সুন্নাহর আকার ধারণ করে। *(আল-আজবিবাতুন নাফেআহ ফিল জুমআহ, আলবানী ৬১-৬৩ পৃঃ)*

তাই তো পরে কোন আলেম সে বিষয়ে অবহিত হয়ে তা রদ্দ করতে গেলে বা তার পরিবর্তে সহীহ সুন্নাহর প্রতি পথ-নির্দেশ করতে গেলে ওদের অনেকে বলে থাকে, 'নতুন হাদীস! ওঁরা কি জানেন না বা জানতেন না?' ইত্যাদি।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মরো না। *(সূরা আলে ইমরান ১০২ আয়াত)*

“হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা নিসা ১ আয়াত)*

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন। যারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।” *(সূরা আহযাব ৭০-৭১ আয়াত)*

আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর বান্দাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে আদেশ করেছেন এবং অনৈক্য ও আপোস-বিরোধিতা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٠٣ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (দ্বীন ও কুরআন)কে শক্ত করে ধর এবং পরস্পর বিছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (জাহান্নামের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি তা থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।

(সূরা আলে ইমরান ১০৩ আয়াত)

এই ঐক্য রক্ষার জন্য, আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করার জন্য এবং বিছিন্নতা থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি বান্দাদেরকে রসূলের উপর নাযেলকৃত অনুশাসনের অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ كِتَـٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝٢ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝٣ ﴾

অর্থাৎ, এই কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন দ্বিধা না থাকে। যাতে এর দ্বারা তুমি (মানুষকে) সতর্ক কর এবং এটা মুমিনদের জন্য উপদেশ। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছেড়ে অন্যান্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। *(সূরা আ'রাফ ২-৩ আয়াত)*

যেমন, তিনি বাপ-দাদা (অনুরূপ বুযুর্গ, আউলিয়া ও বিদআতীদের) সে সব বিষয়ে অনুসরণ করতে নিষেধ করেন যে বিষয় কিতাব ও সুন্নাহর অনুশাসনের বিপরীত। তিনি বলেন,

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝١٧٠ ﴾

অর্থাৎ, আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার তোমরা অনুসরণ কর; তখন তারা বলে, (না-না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যাতে (যে মতামত ও ধর্মাদর্শে) পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।' যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও ছিল না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۝٢١ ﴾

অর্থাৎ, আর যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা সে বস্তর অনুসরণ কর; তখন তারা বলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যাতে পেয়েছি আমরা

তো তাই মেনে চলব; যদিও শয়তান তাদেরকে দোযখ যন্ত্রণার দিকে আহবান করে (তথাপি কি তারা বাপ-দাদারই অনুসরণ করবে)? *(সূরা লুকমান ২১ আয়াত)*

সুতরাং কিতাব ও সুন্নাহর মতামত ছাড়া অন্য কোন মতবাদের দিকে আহবানকারী প্রবৃত্তি, দোযখের দিকে আহবানকারী মানুষ শয়তানের অনুসরণ করতে মুসলিমকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন কিতাব ও সুন্নাহরই অনুসরণ করতে, কেবল ঐ দুটিকেই জীবন-সংবিধানরূপে গ্রহণ ও ধারণ করতে সে আদিষ্ট হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষের পরিত্রাণ ও সফলতা কেবল ঐ দুয়ের অনুসরণেই আছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; তা যদি তোমরা শক্তভাবে ধারণ কর, তবে কোন দিন পথভ্রষ্ট হবে না; আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।" *(মুআত্তা মালেক ইত্যাদি)*

এই বাণীতে নবী করীম ﷺ কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারীর জন্য সুপথ প্রাপ্তি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বনাশী পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষার যামানত নিয়েছেন। যেমন অন্য দিকে আল্লাহর দ্বীনে বিদআত রচনা করতে কঠোরভাবে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন এবং সারা উম্মতকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, আল্লাহর দ্বীনে যে কোন বিদআত পথভ্রষ্টতার কারণ। সাহাবী ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ বলেন, (একদা) আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এমন উচ্চাঙ্গের উপদেশ দান করলেন যাতে আমাদের চিত্ত কম্পিত এবং চক্ষু অশ্রু বহমান হল। আমরা বল্লাম, হে আল্লাহর রসূল! এটা যেন বিদায়ী উপদেশ, অতএব আমাদেরকে কিছু অসিয়ত (অতিরিক্ত নির্দেশ দান) করুন। তিনি বললেন, "তোমাদেরকে আল্লাহ-ভীতি এবং (পাপ ছাড়া অন্য বিষয়ে) আমীর (বা নেতা) এর আনুগত্য স্বীকার করার অসিয়ত করছি! যদিও বা তোমাদের আমীর এক জন ক্রীতদাস হয়। আর অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আমার বিদায়ের পর জীবিত থাকবে তারা অনেক রকমের মতভেদ দেখতে পাবে। অতত্রব তোমরা আমার এবং আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো, তা দন্ত দ্বারা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করো। (তাতে যা পাও মান্য কর এবং অন্য কোনও মতের দিকে আকৃষ্ট হয়ো না।) এবং (দ্বীনে) নবরচিত কর্মসমূহ হতে সাবধান! কারণ, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদআহ (নতুন আমল) ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাঊদ ৪৪৪৩, তিরমিযী ২৮১৫, ইবনে নাজাহ ৪২ নং)*

উল্লেখিত হাদীস শরীফটি উম্মাহর মাঝে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে, ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মতভেদ ও অনৈক্য নির্মূল করতে উদ্বুদ্ধ করে। সুন্নাহর

অনুসরণ করে, জামাআত (সাহাবা)র অনুগমন করে, দাওয়াত পদ্ধতি, কর্ম, কথা ও বিশ্বাসে প্রত্যেক নব রচিত কর্মসমূহ বা বিদআত হতে সুদূরে থাকতে আদেশ করে; যা বিভ্রাট ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী বিতর্ক ও কলহের প্রতি উম্মাহকে টেনে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলার প্রত্যাদেশ ও শরীয়ত উম্মাহর কাছে পৌঁছে না দেওয়া ও যথাযথভাবে তা বিবৃত না করার পূর্বে তাঁর প্রিয় রসূল ﷺ ইহকাল ত্যাগ করেন নি। তিনি উম্মাহকে সে সকল কিছু কর্তব্যাকর্তব্য বর্ণনা করে গেছেন যাতে তাদের পার্থিব ও দ্বীনী কল্যাণ ও ইষ্ট নিহিত ছিল। তিনি উম্মাহকে এমন সমুজ্জ্বল পথে রেখে গেছেন যার রজনীও দিবসের ন্যায় দীপ্তিমান; যে পথ হতে একমাত্র ধ্বংসগামী ব্যতীত অন্য কেউ বক্রতা অবলম্বন করে না।

আর আল্লাহ জাল্লা শানুহ তাঁর প্রিয় নবীর জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ ও তাঁর সম্পদকে সম্পূর্ণ করেছেন। আর সমগ্র মানব ও দানব জাতির জন্য ইসলামকেই একমাত্র ধর্ম বলে মনোনীত ও নির্বাচিত করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ﴾

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (নেয়ামত) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। *(সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ ﴾

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনো তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে। *(সূরা আলে ইমরান ৮৫ আয়াত)*

সুতরাং এখান হতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীন অসম্পূর্ণ নয়, বরং সম্পূর্ণ। আর রসূল ﷺ তা স্পষ্টভাবে প্রচারও করে গেছেন। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের কিছুও গুপ্ত করেছেন, তবে সে নিশ্চয় আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ ﴾

অর্থাৎ, হে আল্লাহর রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা

অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর। যদি তা না কর তবে তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। *(সূরা মায়েদাহ ৬৭ আয়াত)*

অনুরূপভাবে বিদায়ী হজ্জের ভাষণে রসূল ﷺ বিভিন্ন অনুদেশ, বৈধাবৈধ এবং পরস্পরের মান-ইজ্জত হারাম হওয়ার প্রসঙ্গ বিবৃত করার পর বলেছিলেন, "শোন! আমি কি (আল্লাহর প্রত্যাদেশ তোমাদের নিকট যথাযথভাবে) পৌঁছে দিলাম?" সাহাবাবৃন্দ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।' তখন তিনি আকাশের প্রতি হস্তোত্তলন করে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন। আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন।"

অতএব এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনে নতুন কিছু আবিষ্কার করে; যার নির্দেশ না কিতাবে আছে না সুন্নাহতে এবং না খুলাফায়ে রাশেদীন বা কোনও সাহাবার আদর্শে; তা আকীদা হোক বা আমল, কথা হোক বা ইসলামের প্রতি দাওয়াতী পদ্ধতি তবে ঐ ব্যক্তি যেন বলে যে, 'দ্বীন অসম্পূর্ণ, পুর্ণাঙ্গ নয়।' আর সে এই অসম্পূর্ণতাকে নতুন কিছু (বিদআত) রচনার মাধ্যমে পূর্ণতা দান করার দুঃসাহসিকতা করে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।"

অথবা ঐ ব্যক্তি যেন এই বলে বা ধারণা করে যে, 'দ্বীন তো পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু এমন কিছু বিষয় আছে যা নবী ﷺ প্রচার করে যাননি!' অথচ হযরত আয়েশার হাদীস তা ভীষণভাবে খন্ডন করে। অনুরূপভাবে বিদায়ী হজ্জের ভাষণে তাঁর তবলীগ ও প্রচার প্রসঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করে এ বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রাখেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেবে। সম্ভবতঃ যার নিকট (ইল্‌ম) পৌঁছে দেওয়া হবে সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক স্মৃতিমান হতে পারে।"

অতএব বিদআতীর রসনা অথবা অবস্থা যেন বলে যে, 'শরীয়ত পূর্ণাঙ্গ নয়। এমন কিছু বিষয় আছে যা তাতে সংযোজন ও পরিবর্ধন করা ওয়াজেব অথবা মুস্তাহাব।' যেহেতু তার বিশ্বাস যদি এই থাকত যে, শরীয়ত সর্বতোভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত, তাহলে নিশ্চয় তাতে আধুনিক কিছু উদ্ভাবন করে তাকে 'শরীয়ত' নাম দেবার অপচেষ্টা ও দুঃসাহসিকতা আদৌ করত না। আর এরূপ আকীদা ও বিশ্বাসের মানুষ অবশ্যই পথভ্রষ্ট, সত্য ও সঠিক পথ হতে বহু দূরে।

ইবনে মাজেশূন বলেন, আমি ইমাম মালেক (রঃ)কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন বিদআত রচনা করে এবং তা পুণ্যের কাজ মনে করে, সে ব্যক্তি

ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ রিসালতের খিয়ানত (আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রচারে বিশ্বাসঘাতকতা) করেছেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।” অতএব সেদিন যা দ্বীন ছিল না আজও (নতুনভাবে) তা দ্বীন নয়। *(আল ই’তিসাম ১/৪৯)*

ইমাম শাত্বেবী তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ আল-ই’তিসামে বলেন ঃ

১। বিদআতী শরীয়তের বিরোধী ও দ্বীনের পরিপন্থী। কারণ, আল্লাহ আযযা অজাল্ল বান্দাদের জন্য তাঁর ইবাদতের নির্দিষ্ট পথ ও পদ্ধতি নির্ধারিত করেছেন এবং তারই উপরে সৃষ্টিকে তাঁরই আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তিরস্কার ও পুরস্কারের অঙ্গীকারের সহিত সীমাবদ্ধ করেছেন। আর এও জানিয়েছেন যে, কেবলমাত্র তাতেই মঙ্গল নিহিত আছে এবং এর সীমালঙ্ঘনে অমঙ্গল ও বিপদ আছে। যেহেতু আল্লাহ (কিসে ভাল অথবা মন্দ আছে তা) জানেন এবং আমরা কিছুও জানি না। আর বিদিত যে, তিনি তাঁর রসূল ﷺ-কে জগদ্বাসীর জন্য করুণা স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

কিন্তু বিদআতী এসব কিছুকে অমান্য ও অস্বীকার করে। সে মনে করে যে, (আল্লাহর নির্ধারিত ও সীমিত পথ ব্যতীত) আরো অন্যান্য পথও আছে (যাতে তাঁর সামিপ্য ও সন্তুষ্টি লাভ হয়) তিনি যা নির্দিষ্ট করেছেন তাতেই সীমাবদ্ধ নয় এবং যা নির্ধারিত করেছেন সেটাই চূড়ান্ত ও শেষ পথ নয়! যেন সে বলে ‘আল্লাহ জানেন আমরাও জানি।’ বরং আল্লাহর শরীয়তে সংযোজন ও পরিবর্ধন করে সে ভাবে যে, আল্লাহ যা জানতেন না তা সে জেনে ফেলেছে! (নাউযু বিল্লাহ মিন যালিক।)

বিদআতীর এমন কর্ম ও ধারণা যদি স্বেচ্ছাকৃত হয়, তবে নিশ্চয় তা কুফর এবং যদি তা অনিচ্ছাকৃত হয়, তবে তা ভ্রষ্টতা।

২। বিদআতী তার এই কাজে নিজেকে আল্লাহ তাআলার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। কারণ আল্লাহ পাক শরীয়ত প্রণয়ন করেছেন এবং মানুষকে তাঁর সেই বিধান অনুযায়ী বাধ্য-বাধকতার সহিত চলতে আদেশ করেছেন। আর তিনিই এ কাজে একক ও অদ্বিতীয়। কারণ বান্দারা যাতে মতভেদ করে থাকে সে বিষয়ে মীমাংসা তিনিই দান করে থাকেন।

তাই শরীয়ত কোন জ্ঞানলব্ধ বস্তু নয় বা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা রচিত বিধান নয়; যা যে কেউ ইচ্ছা করলে নিজের তরফ হতে রচনা বা সংযোজন করতে পারে। যদি ব্যাপারটা তাই হত, তাহলে আর জগদ্বাসীর জন্য কোন নবী বা রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বিদআতী বিদআত রচনা করে যেন সে নিজেকে

শরীয়ত রচয়িতার প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ মনে করে। তাই সে তার মত শরীয়ত-বিধান উদ্ভাবন করতে সাহস পায় এবং এর দ্বারা মতান্তর ও বিচ্ছিন্নতার দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে প্রয়াসী হয়।

৩। আবার বিদআতী তার এই কাজে নিজের কামনা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। অথচ আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর পথ-নির্দেশ ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? *(সূরা ক্বাসাস ৫০ আয়াত)* অতএব যে ব্যক্তি তার আত্মার প্রবৃত্তিকে আল্লাহর পথ-নির্দেশের অনুসারী করে না তার চেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট আর কেউ নেই।

বিদআত ও বিদআতীর নিন্দাবাদ

আল্লাহর দ্বীনে নব বিধান রচনাকারী বিদআতী যে নিজেকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, কুরআন কারীমে তার নিন্দা করা হয়েছে। কারণ, বিদআতের পথ বক্রপথ। আর যে বক্র পথে চলতে চায় আল্লাহ তার হৃদয়কে বক্র করে দেন। যেহেতু প্রতিশোধ কৃতকর্মের সদৃশ হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ۝ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহও তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ সত্যত্যাগী (ফাসেক) সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। *(সূরা সাফ্‌ফ ৫ আয়াত)*

তাদের এ শাস্তি এই জন্যই যে, তারা কুরআনের রূপক আয়াতের অনুসরণ করে, সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন আয়াত বর্জন করে এবং রূপক আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য অনুসন্ধান করে; বরং আয়াতের অর্থ বিকৃত করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ مِنْهُ ءَايَـٰتٌ مُّحْكَمَـٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَـٰبِهَـٰتٌ ۖ
فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَـٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ ﴾

অর্থাৎ, তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত

সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ। আর অন্যগুলি রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। *(সূরা আলে ইমরান ৭ আয়াত)*

হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "যাদেরকে রূপক আয়াতের অনুসরণ করতে দেখবে আল্লাহ তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন। অতএব তোমরা ঐ ধরনের মানুষ হতে সাবধান থাকো।"

অন্য এক বর্ণনায় বলেন, "যাদেরকে রূপক আয়াত নিয়ে তর্ক-বিবাদ (অনুরূপভাবে রহস্য ও ভেদ বের করার অপচেষ্টা) করতে দেখবে তাদেরকেই আল্লাহ লক্ষ্য করে বলেছেন। অতএব তাদের থেকে সাবধান থেকো।"

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ۚ ﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে কোন কিছুতেই তুমি তাদের মধ্যে নও। *(সূরা আনআম ১৫৯ আয়াত)* (এবং তারা তোমাদের দলভুক্ত নয়।)

ইবনে কাসীর বলেন, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে; যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায় দল, প্রবৃত্তি ও ভ্রষ্টতার অনুগামীরা হয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর রসূলকে সে সব দল হতে সম্পর্কহীন ঘোষণা করেছেন। *(তফসীর ইবনে কাসীর)*

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেন,

﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় এটিই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর ও বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন, যেন তোমরা সাবধান হও। *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত)*

আল্লাহ যে সরল পথের প্রতি আহবান করেছেন তা হল আহমাদ ﷺ-এর চরিত্রাদর্শ; যা কুরআন ও সুন্নাহর পথ এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামের বিধান। আর অন্যান্য বিভিন্ন বাঁকা পথ, বিরুদ্ধবাদী, অন্যথাচারী ও ভ্রষ্টচারীদের পথ; যারা সরল পথ হতে

সরে গেছে, যারা নিজেদের খেয়াল-খুশী ও কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আল্লাহর দ্বীনে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে।

উপরোক্ত আয়াত শরীফে 'বিভিন্ন (বাঁকা) পথ' বলতে বিদআতীদের বিভিন্ন পথ উদ্দিষ্ট হয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, একদা রসূল ﷺ স্বহস্তে একটি (সরল) রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, "এটা আল্লাহর সরল পথ।" তারপর ঐ রেখাটির ডানে ও বামে আরো অনেক রেখা টেনে বললেন, "এই হচ্ছে বিভিন্ন পথ; যার প্রত্যেকটির উপর রয়েছে শয়তান, যে ঐ পথের দিকে আহবান করে (দাওয়াত দিতে) থাকে।" অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন।

বাক্‌র বিন আ'লা বলেন, 'আমার মনে হয় তাঁর উদ্দেশ্য মনুষ্যশয়তানের আহবান; আর তা হচ্ছে বিদআত।'

মুজাহিদ বলেন, 'বিভিন্ন পথসমূহের অনুসরণ করো না। অর্থাৎ, বিদআত ও সন্দিহান কর্মের অনুসরণ করো না।'

বিদআতীদের নিন্দাবাদ যেমন আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তেমনিই বহু সংখ্যক হাদীসে নববীতে তাদের অতি নিন্দা বিবৃত হয়েছে এবং তাদের ভ্রষ্টতা, পাপ ও তাদের আমল অগ্রহণযোগ্যতার কথাও বর্ণিত হয়েছে। যেমন মুস্তাফা ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ বিধানে আধুনিক কিছু রচনা করবে; যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। (পরিত্যাজ্য ও বাতিল।) *(বুখারী ৪/৩৫৫)*

অন্য বর্ণনায় বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা নাকচকৃত ও খন্ডিত।" *(মুসলিম)*

যে ব্যক্তি হেদায়াত (সৎপথের) দিকে আহবান করবে তার পুণ্য হবে ওর অনুসারীদের পুণ্যরাশির মত। তাদের কারোরই পুণ্য কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহবান করবে (বা দাওয়াত দেবে) তার পাপ হবে ওর অনুসারীদের পাপরাজির মত। তাদের কারোই পাপ কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।" *(মুসলিম)*

"কোন জাতি যখন তাদের দ্বীনে কোন বিদআত রচনা করে, তখন আল্লাহ তাদের সুন্নাহ থেকে সমপরিমাণ অংশ তুলে নেন। অতঃপর তা আর তাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত ফিরিয়ে দেন না।" *(দারেমী)*

হওয কওসরের পানি পান করার জন্য পিপাসার্ত লোক (কিয়ামতের) দিন আল্লাহর নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হবে। কিন্তু তাদেরকে নিরুদ্দেশ উঁট বিতাড়িত

করার ন্যায় বিতাড়িত করা হবে। তিনি বলবেন, 'ওরা আমার দলের। (বা ওরা তো আমার উম্মত)।' বলা হবে। তিনি বলবেন, 'আপনি জানেন না, আপনার বিগত হওয়ার পর ওরা কি নবরচনা করেছিল।' তখন নবী ﷺ তাদেরকে বলবেন ঃ "দূর হও, দূর হও।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "আমার পূর্বে আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যেক নবীর জন্যই তাঁর উম্মতের মধ্য হতে বহু শিষ্য ও সহচর ছিল; যারা তাঁর আদর্শ গ্রহণ করত এবং তাঁর সর্বকাজে অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পর তারা আদিষ্ট নয়। অতএব যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে হস্ত দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে রসনা দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন। আর এর পশ্চাতে এক সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকে না।" *(মুসলিম)*

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিদআতী হতে তওবা অন্তরিত করেছেন।"[1] *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬২০নং)*

"যে ব্যক্তি (দ্বীনে) অভিনব কিছু রচনা করে অথবা কোন নতুনত্ব উদ্ভব রচয়িতাকে স্থান দেয় তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাগণ এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তার নিকট হতে নফল ইবাদত (অথবা তওবা) এবং কোন ফরয ইবাদত (অথবা ক্ষতিপূরণ করবেন না।)"

আম্র বিন সালামাহ বলেন, ফজরের নামাযের পূর্বে আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﵁-এর বাড়ির দরজায় বসে থাকতাম। যখন তিনি নামাযের জন্য বের হতেন, তখন আমরা তাঁর সাথে মসজিদে যেতাম। (একদা ঐরূপ বসেছিলাম) ইতিমধ্যে আবু মূসা আশআরী আমাদের নিকট এসে বললেন, 'এখনো কি আবূ আব্দুর রহমান (ইবনে মাসঊদ) বের হন নি?' আমরা বল্লাম, 'না।' অতঃপর তাঁর অপেক্ষায় তিনিও আমাদের সহিত বসে গেলেন। তারপর তিনি যখন বাড়ি হতে

([1]) *পাপকে পাপ মনে করে তওবা করার তওফীক লাভ হয়। কিন্তু বিদআতকে দ্বীন মনে করেই পালন করে বিদআতী। সুতরাং তা থেকে তওবা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না তার মনে। পক্ষান্তরে বিদআতী যদি হক জেনে বিদআত ছেড়ে বিশুদ্ধ চিত্তে তওবা করে তাহলে অবশ্যই তওবার দরজা খোলা আছে। আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতীর তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখেন (গ্রহণ করেন না) যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বিদআত বর্জন না করেছে।" (ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৫১ নং)*

বের হয়ে এলেন, তখন আমরা সকলে তাঁর প্রতি উঠে দন্ডায়মান হলাম। আবূ মূসা আশআরী তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে আবু আব্দুর রহমান! আমি মসজিদে এক্ষনি এমন কাজ দেখলাম, যা অদ্ভুত বা অভূতপূর্ব। তবে আলহামদুলিল্লাহ, আমি তা ভালই মনে করি।' তিনি বললেন, 'কি সেটা? ' (আবু মূসা) বললেন, 'যদি বাঁচেন তো দেখতে পাবেন; আমি মসজিদে এক সম্প্রদায়কে এক-এক গোল বৈঠকে বসে নামাযের প্রতীক্ষা করতে দেখলাম। তাদের হাতে রয়েছে কাঁকর। প্রত্যেক মজলিসে কোন এক ব্যক্তি অন্যান্য সকলের উদ্দেশ্যে বলছে, একশত বার 'আল্লাহু আকবার' পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তকবীর পাঠ করছে। লোকটি আবার বলছে, একশত বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তাহলীল পাঠ করছে। আবার বলছে, একশত বার 'সুবহানাল্লাহ' পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তসবীহ পাঠ করছে।' তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, 'আপনি ওদেরকে কি বললেন?' আবু মূসা বললেন, 'আপনার রায়ের অপেক্ষায় আমি ওদেরকে কিছু বলিনি।' তিনি বললেন, 'আপনি ওদেরকে নিজেদের পাপ গণনা করতে কেন আদেশ করলেন না এবং ওদের পুণ্য বিনষ্ট না হবার উপর যামানত কেন নিলেন না?'

আম্র বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর সহিত চলতে লাগলাম। তিনি ঐ সমস্ত গোল বৈঠকের কোন এক বৈঠকের সম্মুখে পৌছে দন্ডায়মান হয়ে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে একি করতে দেখছি?' ওরা বলল, 'হে আবু আব্দুর রহমান! কাঁকর, এর দ্বারা তকবীর, তহলীল ও তসবীহ গণনা করছি।' তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের পাপরাশি গণনা কর, আমি তোমাদের জন্য যামিন হচ্ছি যে, তোমাদের কোন পুণ্য বিনষ্ট হবে না। ধিক্ তোমাদের প্রতি হে উম্মতে মুহাম্মাদ! কি সত্বর তোমাদের ধ্বংসের পথ এল! তোমাদের নবীর সাহাবাবৃন্দ এখনও যথেষ্ট রয়েছেন। এই তাঁর বস্ত্র এখনো বিনষ্ট হয়নি। তাঁর পাত্রসমূহ এখনো ভগ্ন হয়নি। তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা এমন মিল্লাতে আছ যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর মিল্লাত অপেক্ষা শ্রেষ্টতর অথবা তোমরা ভ্রষ্টতার দ্বার উদ্ঘাটনকারী?!' ওরা বলল, 'আল্লাহর কসম, হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা ভালরই ইচ্ছা করেছি।' তিনি বললেন, 'কিন্তু কত ভালোর অভিলাষী ভালোর নাগালই পায় না! অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, "এক সম্প্রদায় কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তাদের ঐ পাঠ (তেলাঅত) তাদের কণ্ঠ অতিক্রম করবে না।" আর আল্লাহর কসম! জানি না, সম্ভবতঃ তাদের অধিকাংশই তোমাদের মধ্য হতে।'

অতঃপর তিনি সেখান হতে প্রস্থান করলেন। আম্র বিন সালামাহ বলেন, 'নহরওয়ানের দিন ঐ বৈঠকসমূহের অধিকাংশ লোককেই খাওয়ারেজদের সহিত দেখে ছিলাম। যারা আমাদের (হযরত আলী ও অন্যান্য সাহাবাদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়ছিল।' *(সিলসিলাহ ২০০৫নং)*

অধিকাংশ বিদআতীর রচনায় কিছুটা অথবা সম্পূর্ণ সদুদ্দেশ্য থাকে। কোন সৎকাজ করছে মনে করেই নতুন কোন ধর্মীয় কর্ম বিরচিত করে। কুরআনের (বিশেষ করে সিফাতের) আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা ও ভুল তাৎপর্য করে। অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্ট অর্থ ত্যাগ করে নিজের জ্ঞান ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন কূটার্থ উদ্ভাবন করে। হক ও বাতিলের মাঝে খামখা সমন্বয় ও সম্প্রীতি সাধন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নির্দেশিত পথ ব্যতিরেকে ভিন্ন পথে কল্যাণ অন্বেষণ করে। এই ধরনের কিছু কপট মানুষের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ۝ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا ۝ فَكَيۡفَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّآ إِحۡسَٰنٗا وَتَوۡفِيقًا ۝ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَعِظۡهُمۡ وَقُل لَّهُمۡ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَوۡلَۢا بَلِيغٗا ۝ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের শাসক (আমীর ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও রসূলের (কিতাব ও সুন্নাহর) ফায়সালা নাও। এটিই ভালো এবং ব্যাখ্যায় (পরিণামে) প্রকৃষ্টতর। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি কি তাদের দেখনি, যারা ধারণা করে যে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগূতের (আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন আরাধ্য ও মান্য বস্তু

যেমন, মুর্তি, কবর, মাযার,ঝুটা আউলিয়া, মনগড়া কানুন, শয়তান, মন ও প্রবৃত্তি প্রভৃতির) কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায় - যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে (কিতাব ও সুন্নাহর দিকে) এস, তখন তুমি কপটদের তোমার নিকট থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবে। সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তাদের কি অবস্থা হয়? অতঃপর তোমার নিকট আল্লাহর শপথ করে বলবে যে, আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি সাধন ব্যতীত অন্য কিছুই চাইনি। এরাই তো তারা যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদেরকে গোপনে গভীর কথা বল। *(সূরা নিসা ৫৯-৬৩ আয়াত)*

আয়াতের মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যাকারী এক সম্প্রদায় সম্বন্ধে সতর্ক করে রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই কুরআনের ব্যাখ্যার উপর লড়বে, যেমন আমি ওর অবতরণের উপর লড়ছি।" *(মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)*

বিদআতের সংজ্ঞার্থ

বিদআতের আভিধানিক অর্থ; বিনা নমুনা বা উদাহরণে কিছু রচনা বা উদ্ভাবন করা বা আবিষ্কার করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "(আল্লাহ) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আবিষ্কর্তা।" অর্থাৎ বিনা নমুনায় সৃষ্টিকর্তা। *(সূরা বাকারাহ ১১৭ আয়াত)*

বলা হয় বিদআত করেছে ; অর্থাৎ, এমন পথ বা প্রথা রচনা করেছে, পূর্বে যার কোন উদাহরণ ছিল না। যেমন, যে ঘটনা বা কান্ড পূর্বে কখনো ঘটেনি তাকে বলা হয় 'অভূতপূর্ব ঘটনা।'

এই সকল অর্থের প্রতি খেয়াল করে বিদআতকে 'বিদআত' বলা হয়েছে সুতরাং এমন ধর্মীয় বিশ্বাস, কথা বা কাজ যার কোন দলীল শরীয়তে নেই। এই বিদআতীর পূর্বে আল্লাহর রসূল অথবা তাঁর কোন সাহাবী বলেননি বা করেননি, যার কোন ইঙ্গিত দ্বীনে বা কুরআনে অথবা সহীহ সুন্নাহতে নেই, নতুনভাবে তাই বিশ্বাস করা, বলা বা করাকে - যা আসল শরীয়তের সমতুল্য মনে করা হয় এবং অতিরঞ্জন করে তা পালনীয় ধর্মীয় রীতি স্বরূপ করার উদ্দেশ্যে হয় - তাকে বিদআত বলে।

অন্য কথায়, প্রত্যেক সেই আমল (ইবাদত মনে করে বা আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে মনে বা শরীয়ত ভেবে বা করতে হয় অথবা নেই ভেবে, নেকী বা গোনাহ হয় মনে করে) করা বা ত্যাগ করা, যার নির্দেশ বা ইঙ্গিত দ্বীনে নেই তাকে বিদআত বলে। *(হুজাজ ক্বাবিয়্যাহ)*

অতএব যে আমলের মূল দ্বীন বা শরীয়তে আছে এবং কিছুকাল পরে যদি তার নতুনভাবে সংস্কার সাধন করা হয়, তাহলে তাকে আভিধানিক অর্থে 'বিদআত' বলা গেলেও শরয়ী অর্থে তা 'বিদআত' নয়। যেমন কিছু সলফের উক্তি "নি'মাতিল বিদআহ" (উত্তম আবিষ্কার বা বিদআহ) শরয়ী অর্থে বিদআত নয়। হযরত উমার ﷺ যখন সমস্ত লোকদেরকে রমযানের তারাবীহ পড়ার জন্য একই ইমামের পিছনে জমায়েত হয়ে নামায পড়তে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, 'নি'মাতিল বিদআতু হা-যিহ।' (অর্থাৎ, উত্তম আবিষ্কার এটা!) এটা আভিধানিক অর্থে বিদআহ। কারণ, রমযানে জামাআত করে তারাবীহর নামায পড়ার মূল ভিত্তি শরীয়তে ছিল। রসূল ﷺ নিজে সাহাবাবৃন্দকে নিয়ে জামাআত করে দুই-তিন রাত্রি তারাবীহর নামায পড়েছিলেন। তারপর ঐ নামায উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাবে এবং তা আদায় করতে তারা অক্ষম হবে -এই আশঙ্কায় আর কোন দিন জামাআত করে পড়েননি। সুতরাং তা শরয়ী অর্থে বিদআত নয়। পক্ষান্তরে হযরত উমরের বা অন্যান্য খলীফা ও সাহাবার কর্মও সুন্নাহ।

সতর্কতার বিষয় এই যে, হযরত উমার ﷺ বা খুলাফায়ে রাশেদীন ﷺ-দের কোন কাজের দোহাই দিয়ে বিদআত করা বা নবী ﷺ-এর পরে তাঁদের কোন কর্মকে তাঁদের পরবর্তী যুগে কোন নতুন ধর্মীয় কাজ বা প্রথা রচনা করার উপর দলীল মনে করা যাবে না। তাই এ কথা কারো মনে করা উচিত নয় যে, হযরত উসমান ﷺ সমস্ত কুরআনী আয়াতকে জমা করে মুসহাফ বা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন যা এক নতুন কাজ ছিল, তাই আমাদেরও ঐ ধরনের কোন অন্য কাজ করা চলবে, অথবা তাঁদের ঐ ধরনের কর্মগুলি বিদআত ছিল। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উক্তিতে প্রমাণিত যে, তাঁদের যে কোনও কাজ সুন্নাহ, বিদআত নয়; যদি তা তাঁর নির্দেশের পরিপন্থী না হয় তবে। অতএব তাঁদের নির্দেশিত বা কৃতকর্মের আমরা অনুসরণ করতে পারি; কিন্তু তাতে কোন অতিরিক্ত অথবা তাঁদের রচনার অনুকরণে কোন অন্য নতুন কর্ম রচনা করতে পারি না। আবার কোন দেশাচার, লৌকিক বা কোন বৈষয়িক কাজ (ধর্ম না ভেবে করাকে) আভিধানিক অর্থে বিদআত বলা গেলেও

শরীয়তের পারিভাষিক অর্থে তা 'বিদআত' নয় এবং রসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ঐ ধরনের কর্মের উপর সতর্ক করাও নয়। অবশ্য ঐ সমস্ত প্রথা বা কর্ম শরীয়ত পরিপন্থী হলে সে কথা ভিন্ন।

তদনুরূপ কোন বৈষয়িক বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও শরয়ী অর্থে বিদআত নয়। তা সাধারণ কর্মে অথবা দ্বীন ও ইবাদতের অসীলাহ ও মাধ্যমস্বরূপ ব্যবহার করাও বিদআতের পর্যায়ে পড়ে না। যেমন আযান, নামায বা খুতবার জন্যে লাউড-স্পীকার, বিদ্যুৎ বাতি, শিক্ষার অভিনব ব্যবস্থা ইত্যাদিকে বিদআত বলতে পারি না।

পক্ষান্তরে যদি কোন কাজ ইবাদত বা নৈকট্যদানকারী না ভেবে করা হয়, তবে তার তিন অবস্থা হতে পারে;

(১) সে কাজের কোন স্পষ্ট নির্দেশ শরীয়তে না থাকলেও তা ব্যাপক অর্থ ও মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অস্পষ্ট বা পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে না। বরং তা ঐ মূল অর্থ অনুযায়ী ঐ নির্দেশ ওয়াজেব হলে ঐ কর্ম ওয়াজেব; নচেৎ মুস্তাহাব অথবা হারাম হবে।

(২) সে কাজের প্রতি অস্পষ্টও কোন ইঙ্গিত শরীয়তে পাওয়া যাবে না এবং তা মৌলিক নীতি বা ব্যাপক দলীলেরও আওতাভুক্ত নয়। বরং সে বিষয়ে শরীয়ত নীরব। তাহলে তা মুবাহ। অর্থাৎ, তাতে পাপ-পুণ্য কিছুই নেই।

(৩) সে কাজ ব্যাপক কোন দলীলের বা মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এ বিষয়ে শরীয়ত নীরব। কিন্তু তা ইবাদত বা আমলের কেবল অসীলাহ ও মাধ্যম মাত্র। তাহলে তা যে কাজের অসীলা তার হিসাবে অসীলারও গুরুত্ব হবে। যেমন তবলীগ বা ইসলাম প্রচারের জন্য রেডিও, টি,ভি, টেপরেকর্ডার, আযান, জলসা বা দর্সের জন্য মাইক ইত্যাদি আমলের সহায়ক যন্ত্রাদি ব্যবহার করা বিদআতের পর্যায়ে পড়ে না। *(ফারাইদুল ফাওয়াইদ, ইবনে উষাইমীন ১৪৪-১৪৫ পৃঃ)*

বিদআতের প্রকারভেদ

বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিদআতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; বিদআহ হাক্বীক্বিয়্যাহ (প্রকৃত বিদআত) এবং বিদআহ ইযাফিয়্যাহ (অতিরিক্ত বিদআত)।

প্রকৃত বিদআত তখন বলা হয়, যখন ধর্ম-কল্প কাজের ভিত্তি কিতাব, সুন্নাহ অথবা ইজমাতে পাওয়া যায় না। বরং ভিত্তিহীনভাবেই সে কাজকে দ্বীন বলে মেনে নেওয়া হয়। যেমন, কোন সন্দিহানে পড়ে বিনা কোন শরয়ী ওযর অথবা সৎ উদ্দেশ্যে কোন হালাল বস্তুকে হারাম অথবা হারাম বস্তুকে হালাল করা। যেমন, বৈরাগ্য অবলম্বন করা, মাছ-মাংসাদি উত্তম খাদ্য ভক্ষণ না করা, উত্তম পরিচ্ছদ পরিহার করা, প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করা ইত্যাদি। আত্মাকে কষ্ট দিয়ে (যেমন দেহে কাঁটা, জিভে শিক ফুঁড়ে আল্লাহর নৈকট্য আশা করা, জ্যান্ত কবর নিয়ে মাটির উপর হাত বের করে তসবীহ পড়া, মর্সিয়া-মাতমে বুক চিরা, পিঠে চাবুক মারা প্রভৃতির মাধ্যমে) ইবাদত করা বা নেকী লাভের আশা করা।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সহিত জিহাদে (সফরে) থাকতাম এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের পত্নীরা থাকত না। (দীর্ঘ সফরের ফলে যৌনজ্বালা অনুভূত হলে) আমরা তাঁকে বললাম, 'আমরা খাসি করব না কি?' তিনি আমাদেরকে তাতে নিষেধ করলেন এবং বস্ত্রের বিনিময়ে (সফরে) কোন নারীকে বিবাহ করতে অনুমতি দিলেন। অতঃপর এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করেছেন, সে সকলকে তোমরা অবৈধ করো না। সীমালংঘনকারীদেরকে আল্লাহ মোটেই ভালবাসেন না। *(সূরা মায়েদাহ ৮৭ আয়াত, বুখারী ৮/২৭৬)*

আবু কাইস বিন হাযেম বলেন, হযরত আবু বাকর ﷺ আহমাসের যয়নাব নামক এক মহিলার নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি তাকে দেখলেন, সে কথা বলে না।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি ওর, কথা বলে না কেন?' সকলে বলল, 'নীরব থেকে হজ্জ করতে চায়।' তিনি মহিলাটিকে বললেন, 'কথা বল, কারণ, এটা বৈধ নয়। এমন করা জাহেলিয়াতের কাজ।' মহিলাটি তখন কথা বলতে শুরু করল। বলল, 'আপনি কে?' তিনি বললেন, 'মুহাজেরীনদের একটি লোক।' *(বুখারী ৭/১৪৭)*

তদনুরূপ এমন মনগড়া ইবাদত রচনা করা যার বিধান আল্লাহ তাআলা দেননি। যেমন বিনা পবিত্রতায় নামায পড়া, কাওয়ালী, গান-বাজনা প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া ইত্যাদি। অনুরূপভাবে শরীয়তে সুন্নাহকে দলীল মানতে অস্বীকার করা, শুদ্ধ বর্ণনার উপর জ্ঞান ও বিবেককে প্রাধান্য দেওয়া এবং জ্ঞানের নিক্তিতে শরীয়তকে ওজন করা ইত্যাদি।

তদনুরূপ হকীকত, তরীকত বা মারেফত ইত্যাদি নতুন পথ রচনা করা বা মান্য করা। নির্দিষ্ট ধর্মীয় মর্যাদা (বা কামালে) পৌঁছে গেলে -আমল ওয়াজেব হওয়ার শর্তাবলী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও - আর কোন আমল ঐ কামেলের উপর ওয়াজেব নেই ভাবা। অথবা মারেফতীর সেই মঞ্জিলে পৌঁছে গেলে বান্দার নিকট হারাম-হালাল সব একাকার হয়ে যায়; তখন আর তাকে শরীয়তের বাধা মেনে চলতে হয় না, ব্যভিচার, শুয়োর, কুকুর, মাদক দ্রব্য ইত্যাদি হারাম বস্তু তার জন্য হালাল হয়ে যায় -এই ধারণা করা অথবা কোন মরমিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করা ইত্যাদি।

অতিরিক্ত বিদআত তখন হয়, যখন আসল আমল তো বিধেয় থাকে; কিন্তু ঐ বিধেয় কর্মের সাথে আরো কিছু অতিরিক্ত কর্ম মনগড়াভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয়। যার ফলে পুরো কর্মটাই অবিধেয় বিদআত বলে বিবেচিত হয়। লোক মাঝে অধিকাংশ এই বিদআতেরই প্রচলন বেশী। যেমন; নামায, রোযা, যিক্র, দুআ, দরূদ, কষ্টের সময় পূর্ণ অযু প্রভৃতি বিধেয় ইবাদত; যে সবের বিধান শরীয়তে রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি বলে, আমি এক রাকআতে একশ বার কুল পড়ে অথবা প্রতি রাকআতে তিন বার করে সিজদা করে নামায পড়ব, রৌদ্রে কষ্ট ভোগ করে ছায়া থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ না করে রোযা করব, বছরের তিন শ' পঁয়ষট্টি দিনই রোযা রাখব। একত্রিত হয়ে সমস্বরে জামাআতী যিক্র করব, যেখানে বিধেয় নয় সেখানে একত্রে হাত তুলে জামাআতী দুআ করব, জামাআতবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্বরে দরূদ পড়ব ইত্যাদি তবে সে বিদআতী। অযুর সময় অতিরিক্ত বিদআত যেমন, কোন ব্যক্তির নিকট গরম পানি মজুদ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কঠিন শীতের সময় অতি শীতল পানি দ্বারা অযু করা উত্তম মনে করে এবং ঐ পানি দ্বারা অযু করে

আত্মাকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করে।

সুতরাং নামায, রোযা, যিক্র প্রভৃতি শরীয়ত-সম্মত (ফরয) ইবাদত যা পালন করতে বান্দা আদিষ্ট হয়েছে, যা আদায় করতে তাকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং তার বিনিময়ে মহাপুণ্যলাভের প্রতিশ্রুতিও দান করা হয়েছে। কিন্তু তার সহিত পালনের অতিরিক্ত মনগড়া পদ্ধতি ও প্রণালী সম্পর্কে কোন নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়নি। তাই যেমনভাবে তাকে তা পালন করতে বলা হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে তা তার করা উচিত ছিল। তা না করে স্বকপোলকল্পিত পদ্ধতিতে শরীয়তের উপর সংশোধন ও সংযোজন সাধন করার অপচেষ্টা ও দুঃসাহসিকতা করে। অথচ আল্লাহ বলেন, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।"

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ একদল মানুষকে একত্রে সমস্বরে যিক্র করতে দেখে বললেন, 'অবশ্যই তোমরা সীমালংঘন করে (যিক্র করার) এক অভিনব পন্থা (বিদআত) রচনা করেছ অথবা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহচরবৃন্দ অপেক্ষা তোমরা নিজেদেরকে ইল্মে অধিক বড় মনে করছ। নিশ্চয় তোমরা এ ভ্রষ্টতার পাপের জন্য ধৃত হবে।'

অনুরূপভাবে নবী-দিবসের বিদআত; অবশ্যই নবী ﷺ-এর প্রতি ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজেব। "কোন মানুষই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার আপন প্রাণ, সন্তান, পিতা এবং সকল মানুষ (বরং সকল সৃষ্টি) অপেক্ষা তাঁকে অধিক ভালবেসেছে।" *(বুখারী)*

কিন্তু সংসারে প্রত্যেক ভালোবাসা বা প্রেমের এক এক রকম ভিন্ন-ভিন্ন ভাব ও ধরন আছে। বিশ্বপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে ভালবাসার ধরন হল, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর কথার অনুসরণ করা, তাঁর আদর্শে আদর্শবান হওয়া, তাঁর প্রত্যেক নির্দেশ পালন করা, প্রত্যেক নিষিদ্ধ কর্ম হতে বিরত থাকা, তিনি বিদআত (বা দ্বীনে অভিনব পথ রচনা) করতে নিষেধ করেছেন তা মান্য করা।

যদি এসব কেউ করতে পারে তবে সত্যই সে নবীর যথার্থ প্রেমিক বা ভক্ত। নচেৎ যে কেবল মুখে প্রেমের দাবী করে, লোক সমাজে প্রচার করে এবং প্রিয়তমের মন ও আদেশের প্রতিকূলে চলে সে এক কপট ভন্ড প্রেমিক ব্যতীত কিছু নয়। হ্যাঁ, নবী-দিবস এক অভিনব রচিত নবীপ্রেম-বিকাশ পদ্ধতি। যার কোন নির্দেশ অথবা ইঙ্গিত তিনি দেননি। তাঁর একান্ত ভক্ত সাহাবাবৃন্দও ঐ দিবস পালন করে তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের প্রমাণ ও পরিচয় দিয়ে যাননি। অথচ তাঁরা এই ধর্মধ্বজীদের চেয়ে কত

শতগুণ অধিক তাঁর কথার অনুসরণ করতেন, তাঁকে তা'যীম ও ভক্তি করতেন। তাঁদের পরে কোন আহলে সুন্নাহর ইমামও এ পদ্ধতি প্রসঙ্গে কোন ঈঙ্গিত দেননি। এই প্রেম প্রণালী বা ভক্তি প্রকাশের 'ফ্যাশন' রাফেযাহ, ফাতেমী বা উবাইদী ফির্কাহর লোকেরা আবিষ্কার করে মুসলিম সমাজে প্রচলিত করেছে। যে ফাতেমীদের প্রকৃত বংশধারা সুলামিয়ার একজন ইয়াহুদী হতে শুরু হয়।

এই নবী দিবস প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, খ্রীষ্টানদের অনুকরণে অথবা নবী ﷺ-এর মহব্বতে (অতিরঞ্জন করে) কিছু লোক তাঁর জন্ম দিনটিকে 'নবী দিবস'রূপে ঈদের মত পালন করে থাকে। অথচ তাঁর জন্মদিন প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। (অনেকে বলেছেন ১২ রবিউল আওয়াল। কিন্তু সর্বসম্মত অভিমতে তাঁর মৃত্যু দিন ঐ তারীখেই। তাই ঐ দিনে জন্মের খুশী মানালে তাঁর মৃত্যুর দিনে খুশী করা হয়। আবার মৃত্যুর শোক পালন করলে জন্মের শুভ আনন্দের পরিপন্থী হয়।) পরন্তু ঐ দিনটিকে অথবা নবীদিবস নামক কোন ঈদ সফলদের কেউই পালন করে যাননি। (তাঁরা তো কেবল দুটি ঈদই জানতেন।) অথচ যদি ঐ ঈদ পালনে কোন মঙ্গল থাকত, তাহলে আমাদের চেয়ে তাঁরাই তার অধিক হকদার হতেন। (আমাদের পূর্বে তাঁরাই বেশীরূপে তা পালন করে যেতেন।) কারণ আমাদের চেয়ে তাঁদের হৃদয়ে নবী ﷺ-এর মহব্বত ও তা'যীম বহুগুণ অধিক ছিল এবং আমাদের অপেক্ষা তাঁরাই অধিক কল্যাণকর ও পুণ্যময় কর্মের খোঁজ ও আশা রাখতেন।

পক্ষান্তরে প্রকৃত মহব্বত ও প্রেমের পরিচয় তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণে, তাঁর আদেশ পালনে, তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শ দ্বারা জীবন ও চরিত্র গঠনে, তাঁর আনীত শরীয়ত প্রচারে এবং এর উপরে নিজ হস্ত, রসনা ও অন্তর দ্বারা জিহাদে প্রকাশ পায়। মহব্বত প্রকাশের এই পদ্ধতিই প্রাথমিক অগ্রানুসারী মুহাজেরীন ও আনসারদের এবং যাঁরা শুদ্ধচিত্তে তাঁদের অনুগমন করেছেন তাঁদের।' *(ইক্বতিযাউস সিরাত্বিল মুস্তাক্বীম)*

বিদআতকে ভিন্ন আরো তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় ঃ (১) ই'তিক্বাদিয়্যাহ (বিশ্বাসগত) (২) ক্বাওলিয়্যাহ (কথাগত) এবং (৩) আমালিয়্যাহ (কর্মগত)।

১। বিশ্বাসগত বিদআত তখন হয়, যখন কোন কিছুর উপর কারো বিশ্বাস রসূল ও সাহাবার বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়। যেমন খাওয়ারেজদের বিশ্বাস; তারা মনে করে যে, কোন মুসলিম কাবীরাহ গুনাহ (চুরি, চুগলী, হত্যা ইত্যাদি) করলে কাফের হয়ে

চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে। তাই তারা অনেক সাহাবাদেরকেও কাফের মনে করে থাকে। অথচ আহলে সুন্নাহর মতে সে ব্যক্তি কাফের হয় না। পাপের পরিমাণ মত দোযখে শাস্তি ভোগ করে ঈমানের কারণে একদিন জান্নাতবাসী হবে। অথবা আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে জান্নাতে দেবেন।

যেমন অনেকের বিশ্বাস; আল্লাহ সব জায়গায় বিদ্যমান। অথচ আল্লাহ আছেন সপ্তাকাশের উপর আরশে। তাঁর ইল্‌ম আছে সর্বত্রে।

তদনুরূপ এই বিশ্বাস যে, মানুষের কর্ম মানুষেরই সৃষ্টি, আল্লাহর সৃষ্টি নয়, অথবা কর্মে মানুষের কোন এখতিয়ার নেই প্রভৃতি।

২। কথাগত বিদআত তখন হয়, যখন এমন কথা বলা ও প্রচার করা হয় যা কিতাব ও সুন্নাহর বিপরীত। যেমন বিভিন্ন ফির্কা; রাফেযাহ, খাওয়ারেজ, জাহমিয়াহ, মু'তাযেলাহ, আশআরিয়্যাহ প্রভৃতিদের কথা। যারা কিতাব ও সুন্নাহর মৌলনীতি বর্জন করে সাহাবায়ে কেরামগণের সমঝ ও তরীকা প্রত্যাখ্যান করে উভয়ের অপব্যাখ্যা ও ভুল অর্থ মনগড়াভাবে করে থাকে এবং আহলে সুন্নাহ তথা দুনিয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত হক ও ন্যায়ের সপক্ষে জিহাদে তায়েফাহ মানসূরাহ (সাহায্য প্রাপ্ত গোষ্ঠী) এবং আখেরাতে 'ফির্কাহ নাজিয়াহ' (মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়)-এর বিরোধিতা করে থাকে। যারা সাহাবাদেরকে গালি দেয়, কেউ কাবীরাহ গোনাহ করলে তাকে কাফের ও চির-জাহান্নামী বলে, আল্লাহ মহিমান্বিত গুণাবলীর তা'বীল ও অপব্যাখ্যা অথবা অস্বীকার করে ইত্যাদি।

৩। কর্মগত বিদআত তখন হয়, যখন এমন কোন কাজ দ্বীন ভেবে বা করতে হয় ভেবে করা হয়, যা শরীয়তে বর্ণিত কাজ ও তার পদ্ধতির প্রতিকূল হয়। যেমন শবেবরাত, শবে মি'রাজ, মুহার্রাম, চালশে প্রভৃতি পালন করা।

বিদআতের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় (ক) বিদআত মুকাফফিরাহ (খ) গায়র মুকাফ্‌ফিরাহ।

(ক) মুকাফ্‌ফিরাহ বিদআত তখন বলা হয়, যখন ঐ বিদআত করার ফলে বিদআতী কাফের বলে গণ্য হয়। যেমন, সর্ববাদিসম্মত কোন দ্বীনী অনুশাসনকে অস্বীকার করা, কোন ফরয কর্মকে অস্বীকার করা, অথবা যা ফরয নয় তাকে ফরয করে নেওয়া, সর্ব্বসম্মত কোন হালাল বস্তুকে হারাম অথবা তার বিপরীত করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অথবা কিতাব প্রসঙ্গে এমন বিশ্বাস রাখা, যা হতে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং কিতাব পবিত্র। যেমন; আল্লাহর পুত্র আছে ভাবা, রসূলকে আল্লাহ

মনে করা (আহমাদকে আহাদ মনে করা) কুরআনকে মখলুক (সৃষ্ট) মনে করা ইত্যাদি। তদনুরূপ কবর বা আস্তানা পূজা করা এবং জান্নাত, জাহান্নাম, তকদীর, ফিরিশ্তা জিন প্রভৃতি অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা ইত্যাদি।

(খ) গায়র মুকাফ্‌ফিরাহ বিদআত তখন বলা হয়, যখন বিদআত করে বিদআতী তার কারণে কাফের হয়ে যায় না, তবে পাপী নিশ্চয় হয়। যেমন, নির্দিষ্ট সময় হতে নামায দেরী করে পড়া, ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবাহ পড়া, বিভিন্ন পর্ব ও ঈদের উদ্ভাবন করা ইত্যাদি।

প্রকাশ যে,বিদআতে হাসানাহ (যে বিদআত কোন উপকার ও মঙ্গলের খাতিরে রচনা করা হয়) বলে কোন বিদআত নেই; যা করলে পাপ না হয়ে পুণ্যলাভ হয়, অথবা তা মুবাহ। বরং দ্বীনে প্রত্যেক নবীন বিরচনই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই সাইয়েআহ ও ভ্রষ্টতা। বলা বাহুল্য, বিদআতকে বিদআতে হাসানাহ ও বিদআতে সাইয়েআহ এই দুই ভাগে ভাগ করাও এক বিদআত।

রসূল ﷺ জুমআর খুতবায় বলতেন, "নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ কথা আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম হেদায়াত (পথনির্দেশ) মুহাম্মাদ ﷺ-এর হেদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় যাবতীয় অভিনব রচিত বিষয়। প্রত্যেক অভিনব রচিত বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে।"

সতর্কতার বিষয় যে, হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নাহ (প্রথা বা রীতি রচনা বা) চালু করে, তার জন্য রয়েছে ঐ সুন্নাহর সওয়াব এবং তার সওয়াবও যে ঐ সুন্নাহর উপর আমল করে------।"

এর অর্থ এ নয় যে, যদি কেউ শরীয়তে কোন উত্তম কর্ম বা প্রথা নতুনভাবে প্রচলন করে তবে সে ঐ সওয়াবের অধিকারী হবে। বরং এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কোন বিধিসম্মত উত্তম কাজ প্রারম্ভ করে এবং তার দেখাদেখি অন্যান্য লোক সেই কাজ করে, অথবা কোন সুন্নাহর সংস্কার করে; অর্থাৎ, যা আসলে সুন্নাহ ও দ্বীনী রীতি, কিন্তু তার উপর কেউ আমল না করার ফলে তা মৃতপ্রায় থাকে এবং কেউ এসে তা পুনর্জীবিত করে, অথবা এমন পদ্ধতি ও পথ আবিষ্কার করে যা আসলে ধর্ম বা সুন্নাহ না হলেও তা ধর্মের অসীলা বা মাধ্যম; যেমন, মাদ্রাসা নির্মাণ, বই-পুস্তক ছাপা ইত্যাদি, তাহলে তার জন্য ঐ সওয়াবও রয়েছে।

সুতরাং এ ধরনের কর্ম বা সুন্নাহ মানুষ নিজের তরফ থেকে বিরচন করে না; বরং তার সংস্কার বা বৈধ উন্নয়ন সাধন করে যা উত্তম কাজ। আর তা বিদআত নয়।

বিদআতী প্রসঙ্গে মন্তব্য

বিদআতী বা মুবতাদে' (যে বিদআত বা দ্বীনে কোন মান্য ও পালনীয় রীতি রচনা করে তা মানে ও পালন করে, তার প্রতি মানুষকে আহবান ও আকর্ষণ করে এবং তার উপর সম্প্রীতি ও বৈরিতা গড়ে সে) ফাসেকও হতে পারে আবার কাফেরও। যেমন এ কথা বিদআতের প্রকার-ভেদে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু তার পূর্বে এখানে একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, নির্দিষ্টভাবে কোন মুসলিমকে চট্ করে চোখ বন্ধ করে ফাসেক, বিদআতী, কাফের ইত্যাদি বলে আখ্যায়ন করা উচিত নয়। কারণ, এ বিষয়ে শরীয়তে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কতা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে (মুসলিম) ব্যক্তি নিজের (মুসলিম) ভাইকে বলে, 'এ কাফের।' অথচ সে প্রকৃতপক্ষে কাফের নয়, তবে সে কথা তার নিজের উপর বর্তায়।" (অর্থাৎ, সে নিজেকে কাফের করে।) *(মুসলিম)*

এর জন্য শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, কোন মুসলিমকে কাফের বলার অধিকার কারো নেই; যদিও সে ভুল-ভ্রান্তি করে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার উপর হুজ্জত কায়েম (দলীলাদি দ্বারা কুফরী প্রমাণ) করা হয়েছে এবং স্পষ্ট সুপথ ও মত তার জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে। যার 'ইসলাম' নিশ্চয়তার সহিত প্রমাণিত হয়েছে তার 'ইসলাম' কেবল কারো সন্দেহ নিরসনের পরই অপসৃত হতে পারে। *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ১২/৪৬৬)*

কিন্তু যে ব্যক্তি সরল পথ এবং সত্য দ্বীন হতে বহির্ভূত হবে, সে শরীয়ত পরিপন্থী বহু কর্মে আলিপ্ত হবে, তার অবস্থা হবে ভিন্ন। যেরূপ অবৈধ কর্মে সে লিপ্ত হবে ঠিক অনুরূপ মন্তব্য তার উপর করা হবে; স্পষ্ট কুফরী অথবা মুনাফিকী। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি হেদায়াত ও দ্বীনে হক থেকে অপসৃত হয়, যে আবেদ, আলেম, ফকীহ, যাহেদ, দার্শনিক অথবা চিকিৎসক সেই সত্য হতে বাহির হয়ে যায়, যে সত্যের সহিত রসূল ﷺ প্রেরিত হয়েছেন, আল্লাহ তাঁর রসূল প্রমুখাৎ যে সব বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন তার সবটাকে যে বিশ্বাস ও স্বীকার করে না, আল্লাহ ও তদীয় রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে মানে না; যেমন, যে বিশ্বাস রাখে যে, তার পীর তাকে রুজী দান করে, সাহায্য করে, বিপদে রক্ষা করে, অথবা সে তার পীর বা গুরুর ইবাদত (সিজদা, ধ্যান, নযর ইত্যাদি) করে অথবা তাকে আল্লাহর

নবী ﷺ-এর উপর সম্যক প্রাধান্য দান করে অথবা সামান্য কোন বিষয়ে তাঁর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে অথবা মনে করে যে, সে এবং তার পীর রসূলের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নয় (তাদের জন্য শরীয়তের অনুসরণ জরুরী নয়), তবে ঐ ধরনের সকল লোকই কাফের -যদি তাদের ঐ বিশ্বাস ও কর্ম প্রকাশ করে তাহলে। নচেৎ গোপন করলে তারা মুনাফেক।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ঐ শ্রেণীর মানুষের আধিক্য হওয়ার কারণ দর্শিয়ে বলেন, ইল্‌ম ও ঈমানের প্রতি আহবানকারী আলেমের সংখ্যা নগণ্য হওয়ার ফলে ওদের সংখ্যা অধিক বেড়ে গেছে। এ ছাড়া অন্য প্রকার বিদআতী যাদের উপর কোন মন্তব্য করার পূর্বে খুব বিচার-বিবেচনা ও দৃঢ় নিশ্চয়তার প্রয়োজন আছে। কারণ কুফ্‌র আকীদায় (বিশ্বাসে) হয় এবং আমলেও। আর উভয়ের জন্য শরীয়তে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

আবার যে 'কথা' কিতাব-সুন্নাহ ও ইজমা' (সর্বসম্মতি)তে কুফ্‌র তার জন্য সাধারণভাবে বলা যায় যে, যে ব্যক্তি ঐ 'কথা' বলবে সে কাফের হয়ে যাবে; যেমন শরয়ী দলীলে তার সাক্ষ্য বহন করে। (কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষকে তা বলা যাবে না।) ঈমান আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নিকট হতে প্রাপ্ত ও লব্ধ বস্তু। অতএব তা কার আছে এবং কার নেই, সে মন্তব্য কেউ কারো খোয়ল-খুশী বা ধারণা ও অনুমান দিয়ে করতে পারে না।

তাই নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলা যাবে না যে, অমুক ব্যক্তি ঐ 'কথা' বলে তাই সে কাফের। কারণ কাউকে কাফের সাবস্ত্য করার জন্য কয়েকটি শর্ত পূরণ হতে হবে; যেমন, ঐ ব্যক্তি ঐ 'কথা' বলা অবৈধ বা কুফরী তা জানবে, তা সজ্ঞানে বলবে, ঐ 'কথা' অবৈধ হওয়ার বিষয়ে তার নিকট দলীল পেশকৃত হবে। সে তা মনের ভুলে বলবে না, ঐ কথা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে তার মনে কোন সংশয় থাকবে না ইত্যাদি। *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ৩/৩৫৪)*

উপর্যুক্ত শর্তাবলী যদি ঐ ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যায়, তবেই তাকে কাফের বলা যাবে, তার পূর্বে নয়। সুতরাং যদি কেউ বলে যে, সূদ বা মদ হালাল, তবে সে কাফের হবে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা বলা যাবে না। কারণ, এমনও হতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি কারো নিকট হতে কোন দিন শুনেনি যে, তা হারাম। অথবা শুনেছে; কিন্তু মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফলে সে বলছে। অথবা সে মনে করে, তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন শক্ত দলীল নেই। অথবা সে সব কিছু জানত, কিন্তু অসাবধানতায় বা

মনের ভুলে তা হালাল বলে ফেলেছে অথবা ঐ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ও সংশয় আছে তাই হালাল মনে করেছে; যেমন অনেকে ব্যাংকের সূদকে হালাল মনে করে। কারণ ঐ সূদ কুরআনে নিষিদ্ধ জাহেলিয়াতের সূদ বটে কিনা, সে বিষয়ে তার সন্দেহ আছে, অথবা ভাবে যে, কেবল সেই সূদ হারাম যাতে গরীব শোষণ করা হয়; কিন্তু যে সূদ সরকারের নিকট হতে নেওয়া হয় যাতে কোন শোষণ হয় না (?) তা অবৈধ নয় অথবা সন্দেহ করে যে, এটা বড় ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে তার লভ্যাংশ উপভোগ করা অথবা দারুল কুফ্রে সূদ হালাল ইত্যাদি। এগুলির একটি পাওয়া গেলে ঐ ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার এসব অযথা ও অযৌক্তিক সন্দেহ নিরসন হয়েছে এবং তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য দলীল তার সামনে পেশ করা হয়েছে।

অতএব যদি কেউ অজান্তে সূদ খায়, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, হারাম জানা সত্ত্বেও যদি অবহেলা করে খায় তবে সে মহাপাপী (ফাসেক), কোন সন্দেহের কারণে যদি তা হালাল মনে করে, তবে সেও মহাপাপী এবং যে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে হারাম জেনেও হালাল ভেবে খায়, তবে সে সব কিছু জানার পর যেহেতু আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে অস্বীকার করে হালাল মনে করে, তাই সে কাফের হয়ে যায়।

তদনুরূপ কবর পূজা (কবরকে সিজদা করা, তওয়াফ করা, সেখানে মানত মানা, নযর মানা, নযর-নিয়ায পেশ করা ইত্যাদি) শির্ক ও কুফ্র। কিন্তু অমুক মিঁয়া কবর পূজে, তাই সে কাফের -তা চট্ করে বলতে পারি না। কারণ, হয় তো সে জানে না যে, কোন কবরের (মৃত মানুষের) নিকট সুখ-সমৃদ্ধি, সন্তান বা রুজী চাইলে, বা সিজদা করলে শির্ক বা কুফ্র হয় অথবা তা জানে, কিন্তু ঐ বিষয়ে তার কাছে কোন সন্দেহ আছে। যদি এসব কিছু তার নিকট হতে দূর করে দেওয়া হয় এবং তা সত্ত্বেও সে হক ও ন্যায়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন না করে, তবে তাকে কাফের বা মুশরিক বলা হবে, তার পূর্বে নয়।

মোট কথা, যে বিদআতী সবকিছু জেনে-শুনে, নিঃসন্দেহে কোন এমন কাজ করে (যেমন, কোন সর্ববাদিতসম্মত ওয়াজেব বা হারাম অস্বীকার করা, বা কোন সর্বসম্মত হারামকে হালাল বা তার বিপরীত মনে করা অথবা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও কুরআন বিষয়ে এমন ধারণা রাখা, যা শরীয়ত খন্ডন করে ইত্যাদি) যাতে কাফের হতে হয়, তবে সে কাফের।

আর যদি এমন কাজ করে যাতে কেউ কাফের হয়ে যায় না; বরং পাপী হয় (যেমন

সমস্বরে যিক্‌র করা, কিয়াম করা, নামাযের পর জামাআতী দুআ করা প্রভৃতি) তাহলে সে শরয়ী আইনে অবাধ্য হওয়ার ফলে কেবল পাপীই হবে; কাফের হবে না। এদের জন্য হেদায়াত প্রাপ্তির দুআ করা হবে।

মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে। যাঁর সুন্দর আচরণ মন মুগ্ধ করে, যাঁর চলার পথ ও প্রণালী আহলে সুন্নাহর, যিনি শরয়ী যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী, যাঁর ইলমের সাথে ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠতা প্রসিদ্ধ, যিনি অজ্ঞতা, খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে বহু দূরে, যাঁর কথা ও মতের দলীল কুরআন ও সুন্নাহ তাঁর কোন কোন বিষয়ে দু-একটি ইজতেহাদী ভুল ধর্তব্য নয়। সে ক্রটি তাঁকে তাঁর মর্যাদা হতে চ্যুত করে না এবং তাঁর কোন মানহানিও ঘটায় না। তিনি যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁর সেই ক্রটির উপর শিষ্টতা, ভদ্রতা ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁকে অবহিত ও সতর্ক করা উচিত। আপোসের সহৃদ বৈঠকে, শ্রদ্ধাপূর্ণ লেখন বা দূরালাপের মাধ্যমে সৎ ও মঙ্গলে পারস্পরিক সহায়তা করা ওয়াজেব। যেহেতু দ্বীন তার অনুসারীদের পারস্পরিক হিতোপদেশ ও হিতৈষিতার মাধ্যমে পূর্ণ হয়। তাই প্রত্যেক অভিজ্ঞ আলেমের উচিত, তাঁর মান ও মর্যাদা খেয়াল রেখে, দলীলের সহিত, কোন প্রকার রূঢ়তা বা আত্মগর্ব প্রকাশ না করে, প্রজ্ঞা, যুক্তি ও সদুপদেশের সাথে ভুল ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করা। যেমন তাঁরও উচিত, সেই ভুল স্বীকার করে সঠিক ও সত্য গ্রহণ করতে কোন লজ্জা, দ্বিধা ও সংকোচ না করা। এইরূপে ঐক্য, সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকবে এবং সকল মুসলিম ভাই ভাই হয়ে উঠবে - ইন শাআল্লাহ।

কিন্তু ক্রটি করে যদি আলেম ইহলোক ত্যাগ করে থাকেন, তবে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দুআ করতে হবে। কারণ, আম্বিয়াগণ ব্যতীত অন্য কেউই নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ও ক্রটিমুক্ত নয়। তবে তাঁর সেই ভুল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সতর্ক ও সাবধান অবশ্যই করতে হবে; যাতে কেউ তাঁর সেই ভুলের অনুসরণ না করে বসে। তবে ঐ ভুল ও ক্রটি বর্ণনায় যেন ঐ বিগত আলেমের প্রতি কোন অসমীচীন মন্তব্য অথবা তুচ্ছ ধারণা ও মানহানির ইচ্ছা না থাকে।

প্রত্যেক আলেমের উচিত, আহলে সুন্নার আকীদাহ ও বিশ্বাসকে চিরঞ্জীব রাখা, অপরের ইজতিহাদী (খেয়াল-খুশী বা প্রবৃত্তির বশবর্তী নয়, বিদ্বেষ বা ঈর্ষাজনিত নয় এমন) কথা, রায় বা মন্তব্যকে সমীহ ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা এবং ঐ ধরনের বক্তাকে চোখ বুজে কাফের, বিদআতী ইত্যাদি না বলা। বরং মার্জিত আপোস সমঝোতায় আল্লাহর দ্বীনকে এক হয়ে ধারণ করা সকলের মহান কর্তব্য।

বিদআতীর সংসর্গ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, (হে নবী) তুমি যখন দেখ যে, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়বে; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্তি হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। *(সূরা আনআম ৬৮- আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সহিত বসো না, নচেৎ তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। কপট ও অবিশ্বাসীদের সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে একত্রিত করবেন। *(সূরা নিসা ১৪০ আয়াত)*

প্রবৃত্তির অনুসারী এবং বিদআতীদের সহিত উঠা-বসা করতে তাবেঈনদের বহু উলামা সাবধান ও নিষেধ করেছেন এবং তা এই আশঙ্কায় যে, হয়তো বা ঐ বিদআতী তার সঙ্গীর উপরেও বিদআতের প্রভাব বিস্তার করে ফেলবে। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ সৎ ও সাধু সাথী নির্বাচন করতে এবং অসৎ ও মন্দ সঙ্গী হতে দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ঐ দুই সঙ্গীর উপমা বর্ণনা করে বলেন, "সৎ সঙ্গী সুগন্ধি ব্যবসায়ীর ন্যায়; যার নিকট হতে সুগন্ধ ক্রয় করা যায় অথবা সে পার্শ্বে উপবেশনকারীকে সুগন্ধ (আতর) উপহার দিয়ে থাকে অথবা তার নিকট হতে (এমনিই) সুন্দর সুবাস পাওয়া যায়। আর অসৎ সাথী হাপরে ফুৎকারকারী

(কামারের) মত। যার পার্শ্বে বসলে অঙ্গারের ছিটায় কাপড় পুড়ে যায় অথবা তার নিকট হতে বিকট দুর্গন্ধ (এবং দমবন্ধকারী ধুঁয়া) নাকে লাগে।” *(বুখারী, মুসলিম)*

অনুরূপভাবে বিদআতীর সাহচর্য গ্রহণ করলে হয়তো বা সে তার বিদআতকে সুন্দররূপে সুশোভিত করে দ্বীন বলে হৃদয়ে গেঁথে ফেলবে অথবা তার শরীয়ত পরিপন্থী কথা শুনে বা কাজ দেখে চিত্ত দগ্ধ ও ব্যধিগ্রস্ত হবে।

যার জন্য ইমাম হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, কোন খেয়াল-খুশীর অনুসারী ব্যক্তি (বিদআতীর) নিকট বসো না, কারণ, সে এমন কিছু তোমার অন্তরে ভরে দেবে যার অনুসরণ করে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে অথবা তুমি তার প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করবে যাতে তোমার হৃদয় ব্যাধিগ্রস্ত হবে।

আবু কিলাবাহ বলেন, প্রবৃত্তির অনুসরণকারী (বিদআতী)দের সাথে বসো না এবং তাদের সঙ্গে কোন বিষয়ে ঝগড়া বা বিতর্ক করো না, কারণ আমার আশঙ্কা হয় যে, তারা তোমাদেরকে তাদের ভ্রষ্টতায় ডুবিয়ে ফেলবে এবং যা তোমরা জানতে তাতে বিভ্রম ও সংশয় সৃষ্টি করবে।

তিনি আরো বলেন, খেয়াল-খুশীর অনুগতরা ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট এবং দোযখই তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল বলে মনে করি। কোন ব্যক্তি বিদআত রচনা করলেই সে তরবারি হালাল করে নেয়।

আইয়ুব সাখতিয়ানী বলেন, বিদআতী যত বেশী ইজতিহাদ করবে, তত বেশী আল্লাহ থেকে দূর হতে থাকবে।’ এবং তিনি বিদআতীদেরকে খাওয়ারেজ বলতেন। *(ই’তিসাম ১/৮৩)*

ইয়াহয়্যা বিন কাষীর বলেন, যদি বিদআতীকে কোন রাস্তায় দেখ, তাহলে তুমি ভিন্ন রাস্তা ধরে চলো, (এবং তার সহিত সাক্ষাৎও করো না।)

এতে বুঝা যায় যে, অন্যায়ের সহিত কোন আপোস নেই। ‘পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়’ বলে তাদের সহিত কোন বন্ধুত্ব নেই। ‘যে যা করছে করুক, নামে মুসলিম হলেই হবে’ বলে তার কুফ্র ও বিদআতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে অনবধানতায় ঐক্য সৃষ্টি করার কথা যুক্তিযুক্ত নয়। তবে পূর্বোক্ত উক্তিগুলির এ অর্থ নয় যে, তাদের নিকট বসে তাদেরকে সত্যের দিকে আহবানও করা হবে না বা সঠিক পথনির্দেশ করে তাদের ভুল সংশোধন করা হবে না অথবা তাদের বিভ্রান্তি ও সন্দেহ নিরসন করার উদ্দেশ্যে কোন ঠান্ডা বিতর্ক করা হবে না। বরং তাদের সহিত প্রজ্ঞা, যুক্তি, দলীল ও সদুপদেশের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং তাদেরকে

সত্য পথের সন্ধান দিয়ে ভ্রান্ত পথ হতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। কারণ তা ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করার অন্তর্ভুক্ত; যা দাওয়াতি কাজের বিভিন্ন মৌলনীতি ও ভিত্তির অন্যতম। যার আদেশ আল্লাহ তাঁর কিতাবে ঘোষণা করেছেন; তিনি বলেন,

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও মন্দ কার্যে বাধা দান করবে। আর এরাই হবে সফলকাম। *(সূরা আলে-ইমরান ১০৪ আয়াত)*

সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অসৎ কাজ দেখলে তা স্বহস্ত দ্বারা অপসারিত করবে, যদি তাতে সক্ষম না হয়, তবে রসনা দ্বারা, তাতেও যদি সক্ষম না হয়, তবে তার অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করবে) এবং এটা সবচেয়ে দুর্বলতম ঈমান (এর পরিচায়ক)।" *(মুসলিম ৪৯নং, আহমাদ, আসহাবে সুনান)*

সুতরাং বিদআতীদের বিদআতে প্রতিবাদ করা, তাদের সহিত প্রতর্কে তাদেরকে পরাস্ত করা এবং তাদেরকে সৎপথের নির্দেশনা দেওয়া যাদের ক্ষমতায় আছে তারা অবশ্যই তাদের মজলিসে বসে সে উদ্দেশ্য সাধন করবে। কিন্তু যাদের সে ক্ষমতা নেই, দিতে গিয়ে হারিয়ে যাওয়ার যাদের ভয় আছে এবং তাদের বিভ্রান্তিমূলক ও সুশোভিত কথায় প্রভাবান্বিত হওয়ার যাদের আশঙ্কা আছে, তারা যেন তাদের বৈঠকে না বসে।

বিদআতীর প্রতি সলফের ভূমিকা

সলফে সালেহীনগণ বিদআত ও বিদআতীদের প্রতি অতি কঠোর ছিলেন। বিদআতকে প্রতিহত এবং বিদআতীর প্রতিবাদ করতে তাঁরা কখনো দ্বিধা করতেন না। আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'এক সম্প্রদায় আসবে যারা এই সুন্নাহসমূহকে প্রত্যাখ্যান করবে, অতএব যদি তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর (কোন বাধা না দাও), তবে তারা মহাসঙ্কট উপস্থিত করবে।'

উমার বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'রায়-ওয়ালাদের থেকে দূরে থেকো। কারণ তারা

সুন্নাহর দুশমন। হাদীস মুখস্থ করতে অপারগ হয়ে নিজেদের রায় (জ্ঞান) দ্বারা কথা বলে (দ্বীনী বিধান দেয়)। ফলে তারা নিজেরা ভ্রষ্ট হয় এবং অপরকেও ভ্রষ্ট করে।'

ইয়াহয়্যা বিন ইয়া'মুর আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-কে বললেন, 'আমাদের দিকে কিছু লোক বের হয়েছে, যারা কুরআন (বেশী বেশী) পাঠ করে এবং ইল্‌ম অনুসন্ধান করে বেড়ায়।' অতঃপর তাদের আরো অন্যান্য অবস্থা বর্ণনা করে বললেন, 'তারা ধারণা করে যে, তকদীর বলে কিছু নেই এবং সমস্ত বিষয় সদ্য উদ্ভূত, (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পূর্বে কিছুরই তকদীর (ভাগ্য) নির্ধারিত করেননি এবং কিছু ঘটার পূর্বে তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নন।) একথা শুনে ইবনে উমর ﷺ তাঁকে বললেন, 'ওদের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হলে ওদেরকে খবর দাও যে, ওদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং আমার সহিত ওদের কোন সম্পর্ক নেই। আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ যাঁর হলফ করেন, তাঁর শপথ! যদি ওদের কারো উহুদ (পর্বত) সমপরিমাণ সোনা থাকে এবং তা দান করে তবে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তা কবুল করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তকদীরের উপর ঈমান এনেছে।' *(মুসলিম)*

কাতাদাহ বলেন, 'কেউ যখন কোন বিদআত রচনা করে, তখন (আহলে সুন্নাহর) উচিত, তা সকলের সম্মুখে উল্লেখ করা যাতে সকলে তা হতে বাঁচতে পারে।

সলফে সালেহীনগণ এইভাবে বিদআতের খন্ডন, প্রতিবাদ ও প্রতিকার করেছেন। তাঁরা কেবল ভ্রষ্ট বিদআতীদের মত ও পথের খন্ডন করে এবং তাদের বাতিল ও বিভ্রান্তি বর্ণনা করেই তাদের মুকাবিলা করেননি; বরং সকল মানুষকে তাদের মজলিসে বসতে সতর্ক করেছেন, তাদের সহিত কথা বলতে সাবধান করেছেন। তাদের প্রতি স্মিত মুখ হতে, তাদেরকে সালাম করতে এবং তাদের সালামের উত্তর দিতেও বাধা দিয়েছেন। বরং অনেকে তাদের সহিত একত্রে এক পরিবেশে বাস করতেও অপছন্দ ও হুশিয়ার করেছেন।

যেমন আবুল জাওযা বলেন, 'কোন প্রবৃত্তি-পূজারী (বিদআতী) আমার প্রতিবেশী হওয়া অপেক্ষা শূকর ও বানর দল প্রতিবেশী হওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।'

কতক সলফ এমন গ্রাম বা শহর বসবাস করা পরিত্যাগ করেছেন যেখানে বিদআত প্রসার ও দৃঢ়তা লাভ করেছে এবং প্রতিবেশী এমন গ্রাম বা শহরে বাস করেছেন যা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুন্নাহর অনুসারী। যেমন, হুরাইম বিন আব্দুল্লাহ, হানযালাহ এবং আদী বিন হাতেম প্রভৃতি সলফগণ (বিদআতের শহর) কুফা ত্যাগ করে কুর্কীসিয়ায় গিয়ে বসবাস করেছেন এবং বলেছেন, 'আমরা এমন শহরে বসবাস

করব না, যে শহরে উষমান ﷺ-কে গালি দেওয়া হয়। '

হাসান বলেন, 'ইচ্ছার পূজারীদের নিকট বসো না, তাদের সহিত কোন তর্ক করো না এবং তাদের নিকট হতে কিছু শ্রবণও করো না।'

মা'মার বলেন, ইবনে ত্বাউস বসে ছিলেন। ইতিমধ্যে মু'তাযিলার একটি লোক তাঁর নিকট এসে অনেক কিছু বলতে লাগল। তা দেখে ইবনে ত্বাউস আঙ্গুল দ্বারা দুই কান বন্ধ করে নিলেন এবং তাঁর ছেলেকেও বললেন, 'বেটা! কানে শক্ত করে আঙ্গুল রেখে নাও। ওর কোন কথাই শুনো না।'

ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, 'কারো নিকটে কোন ব্যক্তি (ইল্ম তলবের ব্যাপারে) পরামর্শ নিতে এলে সে যদি কোন বিদআতী (আলেমের) ঠিকানা বলে দেয় তবে নিশ্চয় সে ইসলামকে ধোকা দেয়। বিদআতীদের নিকট যাতায়াত করা হতে সাবধান হও। কারণ, তারা হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'

সত্যপক্ষে যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে তার পথপ্রদর্শক, মুরশিদ বা ওস্তাদ মেনে নেয়, তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। কারণ,

'কাক যদি কারো পথের হয় রাহবার
চলাইবে সেই পথে যে পথে ভাগাড়।'

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর তা'যীম ও সম্মান করল, সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করার উপর সাহায্য করল, যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সাক্ষাতে হাসল, সে যেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবতীর্ণ শরীয়তকে গুরুত্বহীন মনে করল, যে ব্যক্তি তার স্নেহ-পুত্তলী (কন্যার বন্ধন) বিবাহ কোন বিদআতীর সাথে (বা ঘরে) দিল, সে যেন তার আত্মীয়তার (পিতা-কন্যার) বন্ধন ছেদন করল এবং যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর জানাযায় অংশ গ্রহণ করল, সে আল্লাহর গযবে থাকে; যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। *(শারহুসসুন্নাহ)*

ইব্রাহিম বিন মাইসারাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে তা'যীম বা শ্রদ্ধা করে সে অবশ্যই ইসলাম ধ্বংসে সহায়তা করে।'

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾

অর্থাৎ, সেদিন কতকগুলো মুখমন্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং কতকগুলো মুখমন্ডল হবে কালো। *(সূরা আলে ইমরান ১০৬ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'সেদিন যাঁদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে তাঁরা আহলে সুন্নাহ অল-জামাআহ (হাদীস ও সাহাবার অনুসারীদল) এবং উলামা। আর যাদের মুখমন্ডল কালো হবে তারা হল, বিদআতী ও ভ্রষ্টের দল। *(তফসীর ইবনে কাষীর)*

সুফইয়ান যওরী (রঃ) বলেন, 'ইবলীসের নিকট পাপের চেয়ে বিদআতই অধিকতর পছন্দনীয়। কারণ, পাপ হতে তওবার আশা থাকে, কিন্তু বিদআত হতে তওবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। (অর্থাৎ, তওবার তওফীকই লাভ হয় না। কারণ, বিদআতী তার বিদআতকে দ্বীন মনে করে থাকে।)

ইবনে আবী আসেম প্রভৃতি বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, "শয়তান বলে আমি মানুষকে বিভিন্ন পাপ দ্বারা সর্বনাশগ্রস্ত করেছি; কিন্তু ওরা আমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও ইস্তিগফার দ্বারা ধ্বংস করেছে। অতঃপর যখন আমি তা লক্ষ্য করলাম, তখন ওদের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি প্রক্ষিপ্ত করলাম। সুতরাং ওরা পাপ করবে; কিন্তু আর ইস্তিগফার করবে না। কারণ, তারা ধারণা করবে যে, তারা ভালো কাজই করছে।"

ইমাম ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, সাধারণ পাপীর ক্ষতি তার নিজের উপরই বর্তায়, কিন্তু বিদআতীদের ক্ষতি ও অনিষ্ট শ্রেণী (বহু মানুষের) উপর ব্যাপক হয়। বিদআতীর ফিৎনা হয় মূল দ্বীনে অথচ সাধারণ পাপীর ফিৎনা তার প্রবৃত্তিতে হয়। বিদআতী সহজ ও সরল পথের উপর বসে মানুষকে সে পথে চলা হতে বিরত করে, কিন্তু পাপী সেরূপ করে না। বিদআতী আল্লাহর গুণগ্রাম ও তাঁর পরিপূর্ণতায় আঘাত হানে, অথচ পাপী তা করে না। বিদআতী রসূল ﷺ কর্তৃক আনীত শরীয়তের পরিপন্থী হয়, কিন্তু পাপী তা হয় না। বিদআতী মানুষকে আখেরাতের সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করে, কিন্তু পাপী নিজেই স্বীয় পাপের কারণে মৃদুগামী হয়। *(আল-জাওয়াবুল কা-ফী)*

সুতরাং বিদআতীরা কেবল গোনাহর জন্য গোনাহগারই হয় না বরং তারও অধিক কিছু হয় (যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।) কারণ, গোনাহগার যখন গোনাহ করে, তখন তাতে অপরের জন্য শরীয়ত-বিধায়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোন আদর্শ বা চিরপালনীয় রীতির রূপ দান করে না; যেমন বিদআতী করে থাকে। অতএব তার দুষ্কৃতি সাধারণ দুষ্কৃতির চেয়ে বহু গুণে বড়। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ ﴾

অর্থাৎ, ওদের কি এমন কতকগুলি অংশীদার আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ লংঘনকারীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। *(সূরা শূরা ২১ আয়াত)*

আবু তালেব বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে (কুরআন সম্বন্ধে) কিছু মন্তব্য করতে বিরত থাকে এবং বলে 'বলছি না যে, কুরআন মখলুক (সৃষ্টি) নয়।' এমন ব্যক্তির সাথে যদি রাস্তায় আমার সাক্ষাৎ হয় এবং সে আমাকে সালাম দেয়, তবে আমি তার উত্তর দেব কি?' তিনি বললেন, 'তার সালামের উত্তর দিও না এবং তার সহিত কথাও বলো না। তুমি তাকে সালাম দিলে (বা সালামের উত্তর দিলে) লোক তাকে চিনবে কি করে? আর সেই বা জানবে কি করে যে, তুমি তাকে মন্দ জানছ? অতএব যদি তুমি তাকে সালাম না দাও তাহলে অপমান স্পষ্ট হয়, জানা যায়, তুমি তাকে মন্দ জেনেছ এবং লোকেও তাকে (বিদআতী বলে) চিনতে পারে।'

বিশেষ করে যে বিদআতে কুফ্‌র হয় সেই বিদআতের বিদআতীদের সহিত সলফ ও তার উলামাদের এই পদক্ষেপ ও ভূমিকা ছিল এবং বর্তমানেও তাই হওয়া দরকার। যেহেতু বিদআত রচনা করে বিদআতীরা প্রকৃত ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেই বিদআত ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের সহিত কোন প্রকার আপোস সম্ভব নয়। ইজতিহাদী আহকাম বা গৌণ বিষয়ে মতান্তরকে দূরে ফেলে আকীদাহ ও মৌলিক বিষয়ে একমত হয়ে একতা সম্ভব। (অবশ্য ইসলামের সকল নীতিই মৌলিক, তাতে গৌণ কিছু নেই।) হানাফী-শাফেয়ী, মালেকী-হাম্বলী প্রভৃতি ইজতিহাদী পৃথক পৃথক মযহাবের মাঝে ঐক্য সম্ভব; যদি সকলে সহীহ সুন্নাহর অনুসারী হয়। নির্দিষ্ট কোন মযহাবের (সহীহ সুন্নাহর বিপরীত) তকলীদ করা ওয়াজেব জ্ঞান যদি ত্যাগ করা হয় এবং কেবল আনুগত্য ও অনুসরণ তাঁর করা হয়, যাঁর সমস্ত সাহাবা, তাবেঈন এবং সকল ইমামগণ করেছেন। আর সামান্য ইজতিহাদী বিষয়ের মতপার্থক্যকে এক ওজর ও অজুহাত বলে মানা যায়। যাতে সকলের নিকট হতে পরস্পর সহিষ্ণুতার সহিত সম্প্রীতি ও আপোস সৃষ্টি করতে সাহায্য পাওয়া যায়; আর সেটাই ওয়াজেব।

কিন্তু যার মতান্তর মৌলিক বিষয়ে কেন্দ্রীভূত তার সহিত ন্যায়ের আপোস সম্ভব নয়। যেহেতু এ মতভেদ সামান্য নয়। এ পার্থক্য হক ও বাতিলের, ঈমান ও কুফ্‌রের, আর ঈমান ও কুফ্‌রের মাঝে আপোস আদৌ সম্ভব নয়। যারা হযরত

আবু বাকর, উমার, উষমান, আয়েশা প্রভৃতি সাহাবা ﷺ-কে গালি দেয় ও কাফের বলে, যারা বলে, এ কুরআন সে কুরআন নয়, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সামনে সিজদাবনত হয়, যারা কবরের নিকট নিজেদের প্রয়োজন ভিক্ষা করে, যারা কাবীরাহ গোনাহগারকে কাফের মনে করে, যারা তকদীরকে অবিশ্বাস করে, যারা আল্লাহর বিভিন্ন সিফাতকে অস্বীকার করে, যারা মারেফতীর দাবী করে মরমিয়া সেজে শরীয়ত ত্যাগ করে, যারা গায়বী খবর জানার দাবী করে, যারা বাউলিয়া হয়ে খানকার মধ্যে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ইত্যাদি। এমন মযহাবধারীরা নিজেদের মযহাবে থেকে সালাফীদের সহিত (বাহ্যিক) আপোস করতে চাইলে অথবা কেউ সালিস করতে চাইলে তা সুদূর পরাহত এবং এক স্বপ্ন। আন্তরিক ও বাহ্যিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাদেরকে নিজেদের সুন্নাহ পরিপন্থী ঐ সালিস বা আপোসে রাজি হলে তাকে সালাফিয়াত বা সুন্নিয়াত ত্যাগ করতে হবে। কারণ, সলফ ও আহলে সুন্নাহর আকীদাহ, নোংরাকে নোংরা ও মন্দকে মন্দ জানা এবং তার কর্তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা আর খাঁটি তওহীদবাদী হক-পন্থীদের সাথেই অন্তরঙ্গ সম্প্রীতি গড়া এবং তা ওয়াজেব। সুতরাং কোন সালাফী ঐ সালিস বা আপোসে সম্মত হলে এবং ঐ জাতীয় দলে শামিল হলে ওতে বাতিল থাকা সত্ত্বেও ওর প্রতি অন্তরঙ্গ সম্প্রীতি রাখবে এবং তা ছাড়া বিরোধী অন্যান্য সবকিছুর প্রতি (সুন্নাহ হলেও) বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং ভাববে এটাই সঠিক ও বাকী বেঠিক। অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়কে অন্যায় জানা সত্ত্বেও কোন স্বার্থে তার প্রতিবাদ করতে নীরব হবে। ফলে ঈমান ও কুফ্র তার নিকট একাকার হয়ে সালাফিয়াত বা সুন্নিয়াত চুরমার হয়ে যাবে। যেহেতু অন্যায়ের সাথে আপোস করে সালাফিয়াত থাকে না। কারণ, হক এক ও অদ্বিতীয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ﴾

অর্থাৎ, হক ও সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি? *(সূরা ইউনুস ৩২ আয়াত)*

আর সে হকের পথ সরল। বাকি ডানে বামে সবই বাঁকা পথ। যাতে ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নেই। যেমন সরল রেখার আয়াত ও হাদীসে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব বলাই বাহুল্য যে, একজন সালাফী বা আহলে সুন্নাহ কোন বিদআতীর দলে একাকার হতে পারে না। (অবশ্য কূটনীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা) আহলে সুন্নাহ ও সালাফী একতার ডাক দেয়, ইসলামী রাষ্ট্র রচনা করতে চায় এবং ঐক্য ও মিলনকে

ওয়াজেবও মনে করে। তবে ন্যায় ও তাওহীদের উপর কিতাব ও সুন্নাহর উপর এবং জামাআত ও সাহাবাগণের সমঝের উপর। কিতাব ও সুন্নাহর ডাকে জামাআত ও সাহাবাগণের সমঝের আওয়াজ ভিন্ন অন্য কোন ঐক্যের প্রতি সালাফীরা আহবান করে না এবং মিথ্যা আহবানে সাড়াও দেয় না। যেহেতু একতা কেবল কিতাব ও সুন্নাহর (শুদ্ধ ও সঠিক জ্ঞানের) প্লাটফর্মে সম্ভব। শির্ক ও বিদআতের 'জগাখিচুড়ি' ময়দানে সম্ভব নয়। কেউ যদি সলফ বা আহলে সুন্নাহর রীতি-নীতি অবলম্বন করে এবং শির্ক ও বিদআত বর্জন করে একতা প্রতিষ্ঠার জন্য বাতিলকে স্বীকৃতি দিয়ে কোন সালাফী আপন (কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ তথা সাহাবার) নীতি ও বিশ্বাসের একটি হরফও ছাড়তে বিন্দুমাত্র রাজী নয়।

পক্ষান্তরে ঐ ধরনের আপোস ও ঐক্যের মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ দেখলেও তাদের আপোষের আন্তরিক ও মানসিক মিল থাকে না। ফলে ঐ মরিচীকাকে দূর হতে পানি মনে হলেও নিকটে বা বাস্তবে তা নয়। যে অট্টালিকা কাঁচা-পাকা-ভুয়া প্রভৃতি ইষ্টক দ্বারা নির্মিত, তা যে তিষ্ঠিতে পারে না অথবা অদূরেই সদ্যঃপাতী হয়, তা সকল স্থপতির জ্ঞান অবশ্যই আছে।

আহলে সুন্নাহ ও সালাফী কি?

জ্ঞাতব্য বিষয় যে, সালাফী বা আহলে সুন্নাহ কোন মযহাব বা দলের নাম নয়। বরং তা এক নীতি ও পদ্ধতির নাম; যার ভিত্তি আল্লাহর রসূল ﷺ স্থাপন করেছেন এবং তাঁর পর তাঁর সাহাবাবৃন্দ যার অনুসরণ করেছেন; আর তাঁরাই সলফ এবং পরবর্তীতে যাঁরা তাঁদের অনুগমন করেন ও ঐ আসল নীতির অনুসরণ করেন তাঁরাও সলফ। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَـٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রাথমিক অগ্রানুসারী এবং (এক বিশ্বাস, এক কথা ও এক আমল ইত্যাদি) সদনুষ্ঠানের সাথে তাদের অনুগমন করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে (আল্লাহতে) সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ হল মহাসাফল্য। *(সূরা তওবা ১০০ আয়াত)*

অতএব যাঁরা তাঁদের অনুগমন করেন, তাঁদের বুঝে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝেন, তাঁদের মত আল্লাহ ও তদীয় রসূলকে ভালোবাসেন এবং তাঁদের পদ্ধতি মত শরীয়তের আনুগত্য করেন, তাঁরাই সালাফী। যাঁরা দ্বীনী কোন কথা বিশ্বাস করতে, বলতে অথবা কোন কাজ করতে কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল খোঁজেন । যাঁরা সহীহ হাদীস ও সলফদের সহীহ উক্তি অনুসারে কুরআনের ব্যাখ্যা করেন, তাঁরাই আহলে সুন্নাহ। সেই সলফে সালেহীনদের জামাআতই একমাত্র ইসলামী জামাআত। ইসলামে আর ভিন্ন কোন জামাআত নেই। এই জামাআতই পৃথিবীতে সাহায্য প্রাপ্ত এবং আখেরাতে মুক্তি প্রাপক। অন্যথা কুরআন ও হাদীস তথা সলফের জ্ঞান ব্যতিরেকে যারা মনের খেয়ালবশে অন্য পথ রচনা করে বা বরণ করে ও এই জামাআত ও তার নীতি হতে ভিন্ন নাম ও নীতি নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়, তারাই ধ্বংস প্রাপক।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দূরদর্শী চিন্তানায়ক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, "বানী ইস্রাঈলরা বাহাত্তর ফির্কায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত তিয়াত্তর ফির্কায় বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে বাহাত্তরটি ফির্কা জাহান্নামে যাবে এবং একটি মাত্র ফির্কা জান্নাতবাসী হবে। ঐ জান্নাতী ফির্কা তাদের, যারা আমার ও আমার সাহাবার আদর্শের উপর কায়েম থাকবে।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)*

পীরশ্রেষ্ঠ হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) বলেন, 'জাহান্নাম থেকে নাজাত প্রাপ্ত ঐ দলটি আহলে সুন্নাহ অল-জামাআহর দল। যার একটি মাত্র নাম আছে তা হল 'আহলে হাদীস'। *(গুনিয়াতুত তালেবীন)*

সুতরাং আহলে সুন্নাহ, হাদীস বা আসার অথবা সালাফীর নীতি এক পূর্ণাঙ্গ সঠিক ইসলামের নীতি যে নীতির উপরে ছিলেন আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবাগণ ﷺ, তাবেঈন ও সকল আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন - ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ বিন হাম্বল এবং অন্যান্য ইমাম (রাহেমাহুমুল্লাহ)গণ। আয়েম্মাগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন বাক্যে একই কথা বলে গেছেন, 'সহীহ হাদীসই আমার মযহাব।'

সেই শ্রেষ্ট ও চিরন্তন নীতি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ-

(১) আলকুরআনে বর্ণিত সমস্ত কথা ও কাজকে নিঃসন্দেহে ও নিঃসংকোচে বিশ্বাস ও ধারণ করা (যে কুরআনে) পূর্ববর্তী কোন প্রকার মিথ্যা ও বাতিল প্রক্ষিপ্ত হয় না।

(২) সহীহ সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, যা আল-কুরআনের ব্যাখ্যাতা ও দ্বিতীয় ওহী (ঐশীবাণী)। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

অর্থাৎ, তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য--। *(সূরা নাহল ৪৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴾

অর্থাৎ, এবং সে (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না। তা তো অহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। *(সূরা নাজম ৩-৪ আয়াত)*

(৩) আল্লাহকে একমাত্র প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, বিধায়ক এবং একমাত্র উপাস্য ও মা'বুদরূপে বিশ্বাস করা। তিনি ছাড়া আর কেউই (সত্য) উপাস্য নেই। গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিশ্বাস্য, কথনীয় এবং করণীয় যাবতীয় ইবাদত কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্যলাভের উদ্দেশ্যে তাঁকেই নিবেদন করা।

(৪) তাঁর সমুদয় আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী)র উপর সেই মত ঈমান রাখা, যে মত তিনি তাঁর কিতাবে নিজে বর্ণিত ও ব্যক্ত করেছেন এবং যে মত তাঁর রসূল ﷺ তাঁর সুন্নাহতে বর্ণনা দিয়েছেন। তার স্পষ্ট অর্থ ও সহজার্থ গ্রহণ করা এবং কোন প্রকার বিকৃতি, হেরফের বা দূর ব্যাখ্যার অনুপ্রবেশ না ঘটানো। অথবা সেই সমূহকে অর্থহীন কিংবা আল্লাহ জাল্লাহ তাআলার ঐ অর্থবহগুণহীন না মনে করা এবং ঐ অর্থের বা গুণের কোন প্রকার উপমা, উদাহরণ, সাদৃশ্য বা স্বরূপতা বর্ণনা না করা। বরং তা কেমন, কি প্রকার, কিরূপ ইত্যাদি প্রশ্নও মনে না আনা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

(৫) আল্লাহ পাক যা অবতীর্ণ করেছেন তা নিজেদের এবং রাষ্ট্রের (জীবন) সংবিধান করা এবং রসূল ﷺ-এর আদর্শ ও বিধান দ্বারা সকল সমস্যার ও বিপদ-বিসম্বাদের ও বিচার-মীমাংসা করা। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতি পালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

(৬) সৎকার্যের আদেশ এবং অসৎ বাধা দান করা এবং সৎপথের প্রতি মানুষকে আহবান করা। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, বল, এটিই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীগণ সজ্ঞানে আল্লাহর প্রতি (মানুষকে) আহবান করি, আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর অংশী স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। *(সূরা ইউসুফ ১০৮ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, তুমি (মানুষকে) প্রজ্ঞা (যুক্তি) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর এবং ওদের সাথে সদ্‌ভাবে আলোচনা কর। অবশ্য তোমার প্রতিপালক। তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথগামী হয়; সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং যারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ জানেন। *(সূরা নাহল ১২৫ আয়াত)*

অতএব সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ এবং আল্লাহর পথে আহবান (তবলীগ) এই দুটি আয়াতের ভিত্তিতে করা। প্রথমতঃ ইল্‌ম বা শরয়ী জ্ঞান ও দ্বিতীয়তঃ হিকমত বা প্রজ্ঞা বা যুক্তি ও দূরদর্শিতা। প্রত্যেক মুসলিম তার সম্বল ও সামর্থ্যানুযায়ী নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ও কর্মসীমার ভিতরে এই দাওয়াত কার্যে অংশ গ্রহণ করবে। আর আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত দায়িত্বভার অর্পণ করেন না। যেমন তাঁর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে সে তার হাতের দ্বারা অপসারণ (বাধা দান) করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে তার জিভের দ্বারা, যদি তাতেও সক্ষম না হয় তবে তার অন্তর দ্বারা (ঘৃণা জানবে) এবং

তা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। *(মুসলিম)*

সুতরাং হস্ত দ্বারা বাধা দেওয়া শাসন কর্তৃপক্ষের কর্তব্য এবং অনুরূপভাবে পরিবারের জন্য তার অভিভাবকের কাজ। মুখ দ্বারা বাধা দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের কাজ। যদি কথার সাহায্যেও গর্হিত কর্ম দূর করতে (ফিতনা ইত্যাদির ভয়ে) সক্ষম না হয়, তাহলে তার উচিত অন্তর থেকে ঐ মন্দকে ঘৃণা করা; নচেৎ ঈমান হারিয়ে যায়।

(৭) দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং মানুষকে মানুষ অথবা জড়ের ইবাদত করা হতে রক্ষা করে একমাত্র মানুষ ও জড়ের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক একক উপাস্যের ইবাদত করতে পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে সর্বপ্রকার জিহাদ করা।

(৮) কারো প্রতি বন্ধুত্ব বা বিদ্বেষ কিতাব ও সুন্নাহর নির্দেশমত করা (কোন দল বা ব্যক্তিত্বের খাতিরে নয়।) আহলে সুন্নাহ বা হাদীসকে ভালোবাসা এবং আহলে বিদআতকে ঘৃণা করা।

(৯) প্রথমে সংশোধন ও তরবিয়তের, অতঃপর সংগঠন ও রচনার পথ অনুসরণ করা।

(১০) কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতিকূল কোনও বক্তার ব্যক্তিপূজা না করা। এই দুয়ের উপর কোন ইমাম, আলেম বা চিন্তাবিদের কথাকে প্রাধান্য না দেওয়া, এ দুয়ের পরিপন্থী সকল মত ও সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র এ দুয়েরই অনুসরণ করা।

(১১) নেতা, আমীর বা রাজার আনুগত্য করা; যদি তারা কোন পাপ কার্যের আদেশ না দেয় এবং স্পষ্ট সপ্রমাণ কুফরীর প্রকাশ ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করা।

(১২) সংখ্যায় কম হলেই পথ চলতে আতঙ্কিত ও ভীত না হওয়া। কেবল মাত্র হক ও দলীলের সাথে সম্মত হওয়া; যদিও বা সারা দুনিয়া বিরোধী হয়।

(১৩) দ্বীনের যাবতীয় আদর্শ ও শিক্ষায়, ব্যবহার ও আচরণে পরস্পর সহানুভূতিশীল হওয়া। সকলে মিলে যেন একটি দেহ; যার কোন একটি অঙ্গ ব্যথিত হলে জাগরণ ও জ্বরে সারা দেহ সমব্যথী হয়। যেমন রসূল ﷺ-এর চরিত্র ছিল আল-কুরআন, তদনুরূপ ছিলেন তাঁর সাহাবাবৃন্দ যাঁরা আমাদের আদর্শ ও সলফ।

বিদআতের প্রথম বিকাশ
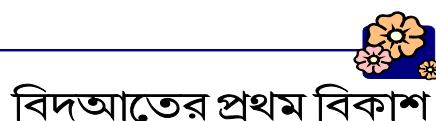
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, 'ইল্‌ম ও ইবাদত বিষয়ক (প্রায়) সর্বপ্রকার বিদআত খুলাফায়ে রাশেদীনের খোলাফত কালের শেষের দিকেই প্রকাশ পায়। যেমন, এ বিষয়ে সতর্ক করে নবী ﷺ বলেছিলেন, "যে আমার পর যে জীবিত থাকবে সে বহু মতানৈক্য দেখতে পাবে, সুতরাং তোমরা আমার ও আমার পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ (আদর্শ)কে আঁকড়ে ধরো।" *(ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ১০/৩৫৪)*

সর্বপ্রথম কদরের (তকদীর বলে কিছু নেই এই বিশ্বাসের) বিদআত বিকাশ লাভ করে অতঃপর 'ইরজা' (আমল ঈমানে শামিল নয় এই বিশ্বাস), 'তাশাইয়্যু' (হযরত আলী প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য ও অধিকারী এই ধারণার উপর ঘটিত) বিদআত এবং খাওয়ারেজ (যারা বলে কাবীরাহ গুনাহকারী কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী তাদের) বিদআত প্রকাশ পায়। এ সমস্ত বিদআতগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাহাবাদের বর্তমানেই ঘটে। যাতে তাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন এবং উচিত মত সে সবের প্রতিবাদ ও খন্ডনও করেছিলেন। বরং হযরত আলী ﷺ খাওয়ারেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অতঃপর মু'তাযিলা আকলানীদের (যারা আকল বা জ্ঞান ও বিবেকের নিক্তিতে শরীয়ত বুঝে তাদের) বিদআত দেখা দেয় এবং মুসলিমদের মাঝে বড় বিঘ্ন ও ফিতনার সৃষ্টি হয়। বিভিন্নমুখী মতানৈক্যে, কলহ-বিবাদ ও খেয়াল-খুশীর পূজা বাড়তে থাকে। তাসাউবুফ (সুফীবাদ) ও কবর পূজার বা মাজারের বিদআত প্রকাশ হয় ইসলামী স্বর্ণযুগের পর এবং সেইভাবে পর পর যুগ অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আরো অন্যান্য রকমারী বিদআতের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্রধান প্রধান বিদআত দেখা দেয় বসরা, কুফা ও শাম থেকে, যা পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

বিদআত সৃষ্টির কারণ

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। যা পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং সর্বাঙ্গসুন্দর কানুন ও সংবিধানরূপে মানুষের নিকট আগত। যার না কিছু পরিত্যাজ্য এবং না তাতে কোন অতিরিক্ত সংযোজন ও অতিরঞ্জন গ্রহণযোগ্য। যার মূল উৎস কিতাব ও সুন্নাহ। যা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করলে কোন বিদআতে বা ভ্রষ্টতায় পড়ার কোন আশঙ্কাই অবশিষ্ট থাকে না। অন্যান্য এই মূল উৎস থেকে অপসারিত হয়ে বিভিন্ন বিদআত সৃষ্টির কারণ নিম্নরূপ ঃ-

(১) অজ্ঞতা

দ্বীন বিষয়ে যথার্থ পড়াশুনা না করা বা না জানা, ধর্মের আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা, সঠিক আরবী ভাষাজ্ঞান না থাকা প্রভৃতি। এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে অবশ্যই মানুষ বিদআত ও ভ্রষ্টতায় পড়তে বাধ্য। যেমন পথ না চিনলে অবশ্যই মানুষ ভ্রান্ত পথে বিপথগামী হতে বাধ্য হয়।

শরীয়ত মুসলিমকে জ্ঞান শিক্ষার উপর ফরযরূপে উদ্বুদ্ধ করে। অজান্তে কোন কথা আন্দাজে বলতে সাবধান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপাচারকে ও অসঙ্গত বিরোধিতাকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করাকে - যার কোন দলীল তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপর এমন কিছু বলাকে যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। *(সূরা আরাফ ৩৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ বান্দাদের নিকট থেকে ইল্ম ছিনিয়ে নেওয়ার মত তুলে নেবেন না। বরং উলামা তুলে নিয়ে ইল্ম তুলে নেবেন। এমতাবস্থায় যখন কোন আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষ মুর্খদেরকে গুরু (ও নেতা) রূপে বরণ করবে। ফলে তারা জিজ্ঞাসিত হলে বিনা ইল্মে ফতোয়া দেবে, যাতে তারা নিজে ভ্রষ্ট হবে এবং অপরকে ভ্রষ্ট করবে। *(বুখারী ও মুসলিম ২৬৭৩ নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমার পূর্বে কোন উম্মতের মাঝে আল্লাহ যে কোনই নবী পাঠিয়েছেন তাঁর জন্যই তার মধ্য হতে সাহায্যকারী ও সহচরবর্গ ছিল; যারা তাঁর আদর্শের অনুসারী ছিল। অতঃপর তাদের পর এমন উত্তরসুরিদের জন্ম হয় যারা যা কাজে করে না তা মুখে বলে এবং যা করতে তারা আদিষ্ট নয় তাই করে। সুতরাং যে

ব্যক্তি এমন লোকদের বিরুদ্ধে নিজ হস্ত দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন। আর এর পশ্চাতে এক সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান নেই।" *(মুসলিম)*

সুতরাং জ্ঞান এমন আলোকবর্তিকা যার দ্বারা মুসলিম আখেরাতের পথ সুস্পষ্টরূপে দেখতে পায় এবং কর্তব্যাকর্তব্য ঐ আলোকে প্রকটিত হয়। ফলে সে নিজে ভ্রষ্ট ও ধ্বংস হয় না এবং অপরকেও ভ্রষ্ট ও ধ্বংস করে না। পক্ষান্তরে জাহেল এক অন্ধ। যে নিজে পথের দিশা পায় না, সুতরাং অপরকে তো পথের সন্ধান বলতেই পারে না। (কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর) এমন অন্ধ নিজে বিদআতী হয় এবং ভুল ফতোয়া দিয়ে, জাল ও যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে আহকাম রচনা করে ও তা প্রচার করে অপরকেও বিদআতী বানায়। অনেকে কিস্সা-কাহিনী এবং স্বপ্নবৃত্তান্ত দ্বারা আমল করে এবং তাই দিয়ে দাওয়াতের কাজ করে। এরা এমন কাঠুরে যারা রাতের অন্ধকারে কাঠ কুড়ায় এবং সাপও কুড়ায়। ফলে নিজেদের ধ্বংস ডাকে এবং যারা তাদের কাঠ ক্রয় করে তাদেরও সর্বনাশ আনে। প্রয়োজন সত্ত্বেও আলো জরুরী মনে করে না। বরং ইল্ম ও উলামার নামে নাক সিঁটকায়। যেহেতু উলামারা ওদের মত কাঠুরে নন তাই।

হযরত জাবের ﷺ বলেন, একদা আমরা সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় পাথরের আঘাত লেগে ক্ষত ছিল। পরে তার স্বপ্নদোষ হল। লোকটি (পবিত্রতা সম্পর্কে) তার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি আছে কি?' তারা বলল, 'না, তোমার জন্য সে অনুমতি নেই। কারণ তুমি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম।' (এই ফতোয়া শুনে) লোকটি গোসল করল। (এবং ক্ষতস্থানে পানি পৌঁছে ক্ষত বর্ধিত হলে) তাতে সে মারা গেল। অতঃপর যখন আমরা নবী ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম তখন ঐ লোকটির কথা জানালাম। তখন ঘটনা শুনে তিনি বললেন, "ওরা ওকে হত্যা করেছে, আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করেন, কেন তারা জিজ্ঞাসা করেনি। যদি তারা জানত না? মুর্খতা রোগের নিরাময় তো প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাই। ওর জন্য তো তায়াম্মুমই যথেষ্ট ছিল।" *(আবু দাঊদ, ইবনে মাজাহ, মুঃ আহমাদ ১/৩৩০)*

এতো ইহকালের ধ্বংসের কথা। কিন্তু ঐ গদ্দিনশীন জাহেল মুশরিকরা তো মানুষের পরকাল মন্দ করে এবং চিরস্থায়ী সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেয়। কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানকে কিতাবী জ্ঞান বা জাহেরী ইল্ম বলে অপদার্থ জ্ঞান করে এবং ওদের কল্পিত বাতেনী বা গুপ্ত কলবী জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলে গুপ্তভাবেই কেবল

নিজেদের ভক্তদের মাঝে প্রচার করে। ফলে ঐ জ্ঞানের কৃষ্ণতমসে নিজেদেরকে ও তার সাথে মুরীদদেরকেও সর্বনাশগ্রস্ত করে। পথের দিশা দিতে গিয়ে হতের দিশা দান করে থাকে।

পক্ষান্তরে অনেকে মনে করে যে, আমলটাই আসল। কোন আলেমের নিকট অযথা সময় নষ্ট করে ইল্‌ম শিক্ষায় কোন লাভ নেই। কিন্তু তারা জানে না যে, ইল্‌ম শিক্ষা করাও এক বড় আমল। বরং বিনা ইলমে আমল সম্ভবই নয়। যাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই অধিক হয়ে থাকে। ইল্‌ম মুমিনের অস্ত্র ও ঈমানের জ্যোতি, তার চিরশত্রু শয়তান তাকে এই অস্ত্র হতে দূর এবং এই জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে সফল হলে তাকে ধ্বংস ও ভ্রষ্ট করা খুবই সহজ হয়। অন্ধকারে পথ ভুল হয়। বিদআত বেড়ে চলে।

'আমপারা পড়ে হামবড়া করে' আর দু'পাতা উর্দু পড়ে ওস্তাজী সেজে অথবা ইমামরূপে প্রত্যেক মহল্লায় 'খাস-খাস' ফতোয় চলে। কেউ বা 'মকসূদুল মুমেনীন' অথবা 'বেহেশ্তী যেওর'কে বুখারী-মুসলিমের দর্জা দিয়ে চোখ বুজে আমল করে। কেউ বা নিম-মৌলভী অথবা শুন-মৌলভীর কথায় ঈমানদার ও পরহেযগার সাজে। সে ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানী আলেম ও মুফতিদের কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। ফলে ঐ সমাজের অবস্থা এই যে, কিতাব ও সুন্নাহর কোন আলেম সঠিক পথ দেখাবার চেষ্টা করলে গদ্দিনশীনরা নিজেদের গদি যাবার ভয়ে তাঁর বিরুদ্ধে 'কাফের' ফতোয়া দিয়ে নিজ ভক্তদের কানে তালা ঝুলিয়ে দেয় অথবা 'নতুন হাদীস' বলে নাক সিঁটকে দেয় ফলে সংস্কার ও সংশোধন কঠিন হয়ে পড়ে, বিদআতের অন্ধকার আরো ঘনীভূত হতে থাকে।

(২) প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণ

বিদআত জন্মের এক কারণ প্রবৃত্তি পূজা। কোনও কর্মকে উত্তম মনে করা হয়, অতঃপর শয়তান সেই কর্মকে অধিক সুন্দর ও সুশোভিতরূপে তার মনে প্রবেশ করিয়ে দেয়। মন তা পছন্দ ও বরণ করে। কখনো বা অভ্যাসগতভাবে ঐ কর্মকেই ধর্ম বলে পালন করে। যখন কারো সতর্কবাণীও গ্রাহ্য হয় না।

বিদআত ঐ প্রবৃত্তিরই বোনা জাল। যে প্রবৃত্তির কাছে কিতাব ও সুন্নাহর ততটা বা কিছুটাও মান নেই। বস্তুতঃ যারাই কিতাব ও সুন্নাহর পথ ছেড়ে অন্য পথে চলতে চায় তারাই প্রবৃত্তির পূজা করে এবং নিজ মনের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে যে, ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। আর আল্লাহর পথনির্দেশ বিনা যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? *(সূরা কাসাস ৫০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴾

অর্থাৎ, ওরা তো কেবল অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। অথচ ওদের নিকট ওদের প্রতিপালকের তরফ হতে পথনির্দেশ এসেছে। *(সূরা নাজ্‌ম ২৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে যে তার খেয়াল-খুশিকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে? আল্লাহ (তার ভ্রষ্টতা) জেনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? *(সূরা জাসিয়াহ ২৩ আয়াত)*

সুতরাং প্রবৃত্তি পূজা এমন এক বিপজ্জনক হৃদরোগ যার কারণে পূজারী মানুষ বিভ্রান্ত ও কুটিলতায় পড়ে সরল পথ থেকে সুদূরে অপসৃত হয়। এমন বক্রপথ অবলম্বন করে যে, সঠিক পথ-নির্দেশ সত্ত্বেও সত্য পথে প্রত্যাবর্তন করতে সম্মত হয় না। পর্বতসম দলীল তার কাছে পেশ করলেও তা অগ্রাহ্য করে নিজের মতের উপরই সুদৃঢ়ভাবে নির্বিচল থাকে। যেহেতু ঐ খেয়াল তার মনে এমনভাবে বদ্ধমূল হয় যে, ন্যায় শুনতে কর্ণ বধির এবং সরল ও সত্য পথ দেখতে চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। কখনো বা কিতাব ও সুন্নাহ থেকেই এমন দলীল বক্রতার সহিত বের করে, যা তার প্রবৃত্তি ও মতের বাহ্যতঃ অনুকূল মনে হয়। কখনো বা একটি মাত্র আয়াত বা হাদীস

অথবা তার কোন একাংশ ধরে তা নিজের মতের উপর দলীলরূপে পেশ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। কিন্তু অন্যান্য আয়াত, হাদীস বা তার পূর্ণাংশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। এমন গোঁয়ার ও ভ্রষ্টলোকের সৃষ্ট বিদআত সবচেয়ে অধিক মারাত্মক।

(৩) সন্দিহান উক্তির উপর নির্ভরতা

বিদআত সৃষ্টির এক কারণ সন্দিহান ও রূপক (দুর্বোধ্য) আয়াত বা হাদীসের মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা করা। যাতে ব্যাখ্যাতা অসঙ্গত তাৎপর্য করে আসল উক্তির পরিবর্তন ঘটায় এবং এক উক্তির সহিত অন্য অক্তি পরস্পর-বিরোধিতা ব্যক্ত করে। কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করে। ঐ সমস্ত রূপক আয়াতের মনগড়া ইল্ম মনে সঞ্চার করে বাতেনী ইল্মের খাজানা পেয়েছে বলে দাবী করে। অথচ এরাই হচ্ছে বক্রতা ও ভ্রষ্টতার ভান্ডার।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূল ﷺ এই আয়াত তেলাঅত করলেন ঃ

﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۗ وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ۝ ﴾

অর্থাৎ, তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন; এগুলি কিতাবের মূল অংশ। আর অন্যগুলি রূপক। যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিৎনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত।' বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা আলে ইমরান ৭ আয়াত)*

অতঃপর তিনি (রসূল ﷺ) বলেন, "সুতরাং যাদেরকে রূপক আয়াতের অনুসরণ করতে দেখবে আল্লাহ তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন, তাই তাদের থেকে সাবধান থেকো। *(বুখারী ও মুসলিম)*

রূপক আয়াত নিয়ে বিদ্যা জাহিরকারী (ভেদ প্রকাশকারী) ও বিভিন্ন সংশয় সৃষ্টিকারী এক ব্যক্তিকে হযরত উমার ؓ প্রচন্ডভাবে প্রহার করে এমন শায়েস্তা

করেছিলেন যে, অতঃপর আর কোন দিন তার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। এমন লোক যে এ যুগে কম, তা নয়। কিন্তু সে উমার আর নেই। তাই তো এমন কেরামতবাজদের বিদআতে ভ্রষ্টতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে মুসলিম সমাজ অধঃপতনের শিকার হয়েছে।

সংশয় এক এমন ভয়ানক ব্যাধি যে, ঐ ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের নিকট আসল ও প্রকৃত বিষয় চাপা পড়ে, হক ও বাতিলের মাঝে তালগোল খেয়ে যায়। কখনো বা এমনও হয় যে, ঐ মানুষ ইসলামী গন্ডি থেকে অজান্তে বের হয়ে যায়। আবার এই ব্যাধির মাধ্যমেই ইসলাম-দুশমনরা মুসলিমদের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে দুর্বল ঈমানের মানুষদের মনে বিপজ্জনক ঈমান-ধ্বংসী জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটায়। ফলে মুসলিম নিজ ঈমানে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করে এবং এক সময় ঈমান-হারা হয়ে যায়।

তাইতো এসব বিষয়ে মুসলিমকে বড় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বিশেষ করে যে সব বিষয়ে অধিক সন্দেহ জাগার সম্ভাবনা থাকে; (যেমন তকদীর, সিফাত প্রভৃতি) সে সব বিষয়ে ঈমান পাক্কা ও মজবুত করা উচিত।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর সিফাত (গুণ) সম্বলিত আয়াতসমূহের কোনটাই রূপক (মুতাশা-বিহ) নয়। কেননা, তাঁর সিফাতের অর্থ আমাদের সুস্পষ্ট জানা, অবশ্য তার রকমত্ব ও স্বরূপ সকলের কাছে অজানা। সুতরাং সে বিষয়ে কারো কোন সংশয় হওয়ার কথা নয়।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলতেন, 'আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর নিকট হতে আগত সকল বিষয়ের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যেরই অনুবর্তী হয়ে ঈমান এনেছি। রসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর নিকট আগত সকল বিষয়ের উপর রসূলের উদ্দেশ্যেরই অনুবর্তী হয়ে ঈমান এনেছি।' *(যাম্মুত তা'বীল)*

ইমাম মালেক (রঃ) আল্লাহর আরশে থাকার কেমনত্ব প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন, 'আরশে থাকা বিদিত, তার কেমনত্ব অবিদিত এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন (কৈফিয়ত) করা বিদআত।'

(৪) কেবলমাত্র জ্ঞানের উপর ভরসা করা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সৃষ্টজগতে অনেকের চেয়ে মানুষকেই অধিকতম শ্রেষ্টত্ব ও সম্মান প্রদান করেছেন। মানুষের দেহ সৃষ্টি-বিচিত্রে তাঁর বিস্ময়কর শক্তি এবং সীমাহীন প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি ঘটেছে। মানুষের দেহ-বিচিত্রে মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি আল্লাহর এক মহাদান। যার দ্বারা মানুষ ভালোকে মন্দ হতে এবং হককে বাতিল হতে পার্থক্য করতে পারে। শরীয়তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে বলা হয়েছে। এই জ্ঞান ও বিবেক যাতে বিনষ্ট না হয়ে যায়, তার বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিন্তু মানুষ এই অমূল্য জ্ঞান-সম্পদকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও অবহেলার শিকার হয়েছে। কিছু মানুষ আছে যারা কোন বিষয়ে জ্ঞান খাটাতেই চায় না; বরং অন্ধভাবেই সবকিছু বিশ্বাস করে ও মেনে নেয়। এমন কি যেখানে শরীয়ত আদেশ করেছে, সেখানেও জ্ঞানকে ব্যবহার করতে কার্পণ্য বা আলস্য করে। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ٥٣ ﴾

অর্থাৎ, আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের (দেহ) মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা সত্য। একি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে সাক্ষী? *(সূরা ফুসসিলাত ৫৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩ ﴾

অর্থাৎ, এভাবে আল্লাহ সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন; যাতে তোমরা চিন্তা কর। *(সূরা বাকারাহ ২১৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠ ﴾

অর্থাৎ, বল অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্‌ কি সমান? তোমরা কি অনুধাবন কর না? *(সূরা আনআম ৫০ আয়াত)*

এইভাবে কুরআন মাজীদের বহু স্থানে “তোমরা কি বুঝনা? যাতে তোমরা বুঝ, যদি তোমরা বুঝ, ওরা কি জ্ঞান করে না? জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, তোমরা কি

চিন্তা কর না? যাতে তোমরা চিন্তা কর, যাতে ওরা চিন্তা করে, চিন্তাবিদদের জন্য নিদর্শন রয়েছে” প্রভৃতি বলে জ্ঞান ও চিন্তা করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু অনেকে জ্ঞান খাটায় না।

পক্ষান্তরে কতক মানুষ আছে, যারা সর্ববিষয়ে নিজের আকেলকেই প্রাধান্য দেয়, সবকিছুকেই বিবেকের নিক্তিতে ওজন করে। জ্ঞানকেই ভালো-মন্দ বুঝার উৎস মনে করে। নিজেদের জ্ঞান যাকে সত্য বলে তারা তাকে সত্য মানে এবং যাকে অসত্য বলে তাকে তাই মানে যদিও তা কিতাব ও সুন্নাহর (প্রকৃত জ্ঞানের) প্রতিকূল হয়। যার ফলে বহু বিদআত এই আকেলের ছাঁচে সৃষ্টি হয়েছে। আর এরই জন্য ভ্রষ্টতা ও বহু সংখ্যক ফিতনা, বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি সংঘটিত হয়েছে, কত সুন্নত উঠে গেছে, উম্মাহর মাঝে বিছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে এবং কিতাব ও সুন্নাহর বিভিন্ন উক্তিকে বিকৃত ও হেরফের করা হয়েছে।

অথচ শরীয়তে এমন কিছু নেই যা মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের প্রতিকূল। অবশ্য অনেক বিষয় আছে, মানুষের সীমিত জ্ঞান যার প্রকৃতত্ত্বের ছোঁয়া পায় না। ফলে সে তাতে বিমূঢ় ও হয়রান হয়ে যায়। কিন্তু তা বলে জ্ঞানের বাহুবলে তা অমান্য নয়। যেহেতু মানুষের জ্ঞান থাকলেও তার পরিসর সীমাবদ্ধ এবং সৃষ্টিকর্তা শরীয়তদাতার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরিসীম। তাঁর সকল হিকমত বুঝে ওঠা মানুষের সাধ্য নয়। সুতরাং শরীয়তের উপর জ্ঞানের চাকা সর্বক্ষেত্রে সচল নয়।

কিন্তু বিরলভাবে কতক মানুষ এই নিয়মের বিরোধিতা ও ব্যতিক্রম করে তারা নিজেদের অপরিসর জ্ঞানের বহরকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে উর্ধ্বে বাড়িয়ে থাকে, তাদের শাক-বেচা দাঁড়িপাল্লাতে সুবৃহৎ পর্বত ওজন করতে চায়! কেবল বিবেককেই ধর্মাধর্মের কষ্টিপাথর মনে করে। শরীয়তের বিষয়াবলীকে জ্ঞানের মিটারে মেপে থাকে! তাদের জ্ঞানে ধরে না -এমন ইলাহী খবরকে রদ্দ্ করে দেয় এবং জ্ঞান ও রুচি থেকে হালাল ও হারাম মানে; যদিও ইলাহী কানুনে তার বিপরীত বলে ঘোষিত থাকে। 'এতো ভালো জিনিস, ওতে ক্ষতি কি? এটা কুসংস্কার' ইত্যাদি বলে নবনব ভিত্তিহীন ইবাদত-অনুষ্ঠান রচনা করে থাকে অথবা ধ্বংস করে থাকে- যার অনুমতি মা'বুদ দেননি।

আকেলের ঘোড়া ছুটিয়ে বাস্তববাদীরা বহু দ্বীনী প্রকৃতত্বকে অস্বীকার ও রদ্দ করে থাকে। বিশেষ করে অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য বিভিন্ন ইলাহী ও নববী খবরকে অবিশ্বাস করে; যদিও বা তা শুদ্ধভাবে প্রমাণিত। যেমন ফিরিশ্তা ও জিন-জগৎ,

কবরের আযাব, যাদু-প্রতিক্রিয়া, ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসার (আঃ) আবির্ভাব, দাজ্জালের ফিতনা, রসূলের মি’রাজ, সিনাচাক, পরকালে মীযান, হাওয, পুল-সীরাত প্রভৃতি গায়বী বিষয়কে তারা অবিশ্বাস করে।

পক্ষান্তরে, প্রত্যেক সুস্থ-মস্তিষ্কের মুসলিমের নিকট বিদিত যে, আল্লাহ বা তাঁর রসূল থেকে যখন কোন খবর শুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়, তখন তা মান্য করা অথবা রদ্দ করাতে আকেলের কোন হাত থাকে না। বরং তাতে দৃঢ় প্রত্যয় রাখা এবং মান্য করা ওয়াজেব হয়ে যায়; চাহে জ্ঞান ও বিবেক সেই খবরের প্রকৃতত্ত্বের নাগাল পায় অথবা না পায়। যেহেতু জ্ঞান প্রত্যেক বিষয়েরই প্রকৃতত্ত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম।

হাজারে আসওয়াদকে চুম্বনকালে হযরত উমার ফারূক ﷺ এই তত্ত্বকেই সামনে রেখে বলেছিলেন, ‘আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর; তুমি না কারো উপকার সাধন করতে পার, আর না-ই কারো অপকার। যদি রসূল ﷺ-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।’ *(বুখারী)*

সুতরাং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, “যখন মুমিনদের আপোসের কোন বিষয়ের ফায়সালার জন্য তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, ‘আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।’ আর ওরাই হল সফলকাম।” *(সূরা নূর ৫১ আয়াত)*

(৫) ইমাম ও বুযুর্গদের অন্ধানুকরণ ও পক্ষপাতিত্ব

বিদআত প্রসারের এটি অন্যতম প্রধান কারণ। আকীদা ও আহকামে আল্লাহ ও রসূলের উক্তি এবং মীমাংসার উপর বিদআতীরা নিজেদের বুযুর্গদের কথা ও ফায়সালাকে অগ্রাধিকার দেয়। অন্ধভাবে তাই বিশ্বাস করে যা তাদের মাননীয় বুযুর্গ বলে। অতিরঞ্জনে অনেকে তাদের বুযুর্গকে ত্রুটিহীন নিষ্পাপ মনে করে। মনের আসনে মান্যবর বুযুর্গ বা আলেমকে এমন স্থান দেয় যে, সে যা বলে বা যা করে, তাই তাদের ধর্ম, কর্তব্য ও বিশ্বাস্য হয়। আর এর বিপরীত সবকিছু অধর্ম ও অমান্য হয়; যদিও বা এই বিপরীত কর্ম ও বিশ্বাস কুরআন ও সহীহ সুন্নায় বর্তমান থাকে। ব্যক্তি পূজার এই অতিরিক্ততায় অনেকে মনে করে যে, তাদের বুযুর্গ যা জানে তা আর অন্য কেউ জানে না বা জানতে পারে না।

ঠিক অনুরূপ অবস্থা বহু মযহাবের মুকাল্লেদগণেরও হয়ে থাকে, তাদের ইমাম বা ফকীহ যা বলেন, অন্ধভাবে তাই তারা মান্য করে এবং প্রতিকূল সমস্ত কথা ও

অভিমতকে অনায়াসে রদ করে দেয়; যদিও বা তা কুরআন ও সহীহ সুন্নায় থাকে। কেবলমাত্র ইমামের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখে। বরং এখানেই শেষ নয়। ওদের অনেকে বলে থাকে যে, 'প্রতি সেই আয়াত ও হাদীস যা আমাদের মযহাবের বিপরীত ও বিরোধী হয়, তা ব্যাখ্যেয় অথবা রহিত (মনসূখ)!' *(রেসালা কারখী)*

এই তাকলীদ মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কঠিন অন্ধ পক্ষপাতিত্বের ফলে বিদআত বেড়ে চলেছে। যার কারণে কেউ আর কুরআন-হাদীস শুনতে চায় না। ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে অনেকে বলে, 'ওসব আমাদের বুঝার ক্ষমতা নেই, তাঁরা সব বুঝে প্রকাশ করে গেছেন।'

অথচ একথা বিদিত যে, ইমামগণের নিকট সকল সহীহ হাদীস পৌঁছেনি। পৌঁছলে নিশ্চয়ই তার বিপরীত কোন রায় তাঁরা দিতেন না। কারণ তাঁরা সকলেই কুরআন ও হাদীসেরই অনুসারী ছিলেন -এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁরা মুজতাহেদীন মানুষ ছিলেন। তাঁদেরও ভুল হতে পারে। যেমন তাঁরা সকলেই তাঁদের কারো অন্ধানুকরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে গেছেন এবং তাঁদের কোন কথা কোন সহীহ হাদীসের প্রতিকূল বা খেলাফ হলে হাদীসের মতকেই গ্রহণ করতে আদেশ করে গেছেন।

সুতরাং মানুষ কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে যে, তারা কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করেছিলেন কিনা? কোন ইমাম বা বুযুর্গের অনুসরণ করেছিল অথবা না করেছিল -সে সম্পর্কে তাদেরকে কৈফিয়ত করা হবে না।

পক্ষান্তরে স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা ভ্রষ্ট জননেতা ও তাদের অনুসারীদের প্রসঙ্গে বলেন,

﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ۝٦٦ وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ۝٦٧ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝٦٨ ﴾

অর্থাৎ, যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমন্ডল উল্টে-পাল্টে দগ্ধ করা হবে সেদিন ওরা বলবে, 'হায় আমরা যদি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করতাম।' ওরা আরো বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও গুরুদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল; হে আমাদের প্রভু! ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং মহা অভিসম্পাত করুন।' *(সূরা আহযাব ৬৬-৬৮ আয়াত)*

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ সকলকে তামাত্তু' হজ্জ করতে আদেশ করতেন। (যেহেতু রসূল ﷺ সকলকে সেই আদেশই করেছিলেন।) কিন্তু এক প্রতিবাদী বলল, 'না, তামাত্তু' করা জরুরী না। কারণ, আবু বাকর ও উমার ﷺ তা করতে নিষেধ করেন। (আর তারা আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও আনুগত্যের অধিক হকদার।) তা শুনে ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, 'অবিলম্বে তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ হবে। আমি তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন আর তোমরা বলছ, আবু বকর ও উমার বলেছেন?' *(যাদুল মাআদ ২/১৯৫, ২০৬নং)*

সুতরাং উদার ও অকুন্ঠ মনে যে এই নীতিকে বুঝে নেবে তার নিকট সকল প্যাঁচ ও সমস্যা বন্ধন হারিয়ে সহজ হয়ে যাবে। ইসলাম ও আনুগত্যের ব্যাপারে তার মনে কোন জটিলতা জট পাকাবে না। আর মুসলিমদের মাঝেও কোন দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট থাকবে না। বিদআত আখড়া ছেড়ে পলায়ন করবে এবং উক্ত স্থানে সুন্নাহ শোভমান হবে।

(৬) বিদআতীর সংসর্গ

বিদআতীর সংসর্গ ও সাহচর্য বিদআত প্রসারে সহায়ক হয়; বিশেষ করে যদি সহচরের কোন পার্থক্য জ্ঞান না থাকে। আবার সময়-কাল দীর্ঘতার সাথে সাথে বিদআতকে লঘু জ্ঞান (বরং সুন্নাহ মনে) করা হয়। ফলে সাথীর মত সাথীও ঐ বিদআতে আমল শুরু করে বসে। এই সংসর্গ প্রসংঙ্গে বহু সকর্তবাণী পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

(৭) উলামাদের নীরবতা ও স্বার্থান্বেষিতা

আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ ﴾

অর্থাঃ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য থেকে নিষেধ

করবে এবং ওরাই হবে সফলকাম। *(সূরা আলে ইমরান ১০৪ আয়াত)*

কিন্তু এই উম্মাহ যে সমস্ত বিপদ ও দুর্বলতার সম্মুখীন, তার মধ্যে উলামাদের আলস্য ও নীরবতা অন্যতম। আল্লাহর অর্পিত এই মহান দায়িত্ব পালনে উলামাগণ তোষামদ ও মনোরঞ্জনের পথ অবলম্বন করেছেন। উদরপূর্তি, অর্থ লাভ, কিছু আনন্দোপভোগ, পদ ও গদি বহাল প্রভৃতি স্বার্থলাভের খাতিরে বিদআত থেকে নিষেধ করা তো দূরের কথা বরং তাতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। বরং তার চেয়েও বিস্ময়কর কথা এই যে, স্বার্থবশে তাতে শরীক হয়ে তার সুষ্ঠু উদ্‌যাপন করে থাকেন। যাঁদের অনেকে বেনামাযীর জানাযা পড়েন না। কিন্তু তার চালশে (মীলাদ) পড়তে বা তার নামে কুরআনখানী বা শবীনা পড়তে কখনো ভুল করেন না।

অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, কর্তব্যপরায়ণ আলেমই সমাজে নেই। এমন আলেম তো প্রতি দেশ ও যুগে থেকেছেন ও আছেন; যাঁরা সুন্নাহ থেকে বিদআতের পার্থক্য-নির্বাচন করেন এবং ভালো-মন্দ বিচার করে ভালোর পথে চলতে সমাজকে আদেশ করেন। বিদআতকে দস্তুরমত খন্ডন করেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই কম। আর লোকেরাও তাঁদেরকে চিনতে ভুল করে।

প্রতিহত না হলে বাতিল খুব শীঘ্রই বেড়ে উঠতে থাকে। উলামাদের তরফ থেকে কোন বাধা না পেলে বিদআত অবলীলাক্রমে বিস্তার লাভ করতে থাকে। বরং এই নীরবতা অনুমতি ও সমর্থনের লক্ষণ হয় এবং সমাজে তা সুন্নাহ বলে সুপরিচিত হতে থাকে।

বর্তমানে মুসলিম জাহানের প্রতি দৃষ্টি ফিরালে দেখা যাবে যে, কত স্বনামধন্য উলামার কর্ণ ও চক্ষুর সামনে ছোট-বড় কত বিদআত ঘটছে ও বেড়ে চলেছে অথচ তার প্রতিবাদ ও প্রতিকারে স্বল্প কয়েকজন ব্যতীত কেউ মুখ খুলেন না বা কলম ধরেন না। বরং গদি ও পজিশন যাবার আশঙ্কায় অথবা কোন কূটনীতির খাতিরে অনেকে তাতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। যাতে সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা জন্মে যে, 'তা বিদআত নয় বরং সুন্নাহ। তা না হলে অমুক সাহেব করবেন কেন?' আবার কেউ যদি বাধা দিতে চান তাহলে তিনি শুনবেন, 'তুমি আর কতটুকু জানো? বিদআত হলে অমুক (জাঁদরেল) সাহেব বলে যেতেন না, বলতেন না বা করতেন না। তাঁরা কি আলেম ছিলেন না? ওঁরা কি আলেম নন, ওঁরা কি কুরআন হাদীস জানেন না বা বুঝেন না? যত নতুন আলেম তত নতুন নতুন ফতোয়া নতুন নতুন হাদীস ইত্যাদি।

কিন্তু এ মিসকীনরা জানে না যে, সব বিষয় সবারই পক্ষে জানা বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যেমন, সুন্নাহর সহীহ-যয়ীফ-মওযু'র পার্থক্যজ্ঞান সকলের কাছে থাকে না। আবার সমস্যা আরো অধিক ঘোরতর হয় তখনই যখন প্রতিবাদ শুনে পূর্বোক্ত সাহেব মানহানির ভয়ে হক কবুল করতে না চান। পক্ষান্তরে যারা হক বলতে চুপ থাকে তারা বোবা শয়তান। (অবশ্য যেখানে ফিতনার ভয় থাকে সেখানকার কথা ভিন্ন।) বলা বাহুল্য, অন্যায়ের প্রতিবাদে আলস্য সাজে না। ভয়, দুর্বলতা বা তোষামদ মানায় না। দুর্বল ঈমানের পরিচয় দিয়ে কেবলমাত্র অন্তর দ্বারা ঘৃণাই যথেষ্ট নয়। 'আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহই সকলের উচিত বিচার করবেন' বলে গড়িমসি চলে না, অথবা 'এ কাজের জন্য আমি ছাড়া আরো অনেক লোক আছে' বলে কর্তব্যহীনতা প্রকাশ শোভা পায় না। আলেম হয়ে (সামর্থ্যানুযায়ী) আলেমের ভূমিকা ও কর্তব্য পালন না করলে তিনি বড় যালেম হবেন নিজের জন্য এবং সমাজের জন্যও।

অনেকে বলেন, 'সুন্নাহ প্রচার করতে গিয়ে জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য সৃষ্টি হয়, ফলে সুন্নাহর প্রচার ফিতনার কারণ হয়; তাই চুপ থাকাই ভালো।'

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুন্নাহর প্রচার ফিতনার কারণ হয় না। বরং সুন্নাহর প্রতি অজ্ঞতাই ফিতনার মূল কারণ। যেমন সহীহ সুন্নাহ প্রচার করলে যে বলে, 'এটা নতুন হাদীস' সে এই কথা দ্বারা এই দাবী করে যে, সে যাবতীয় হাদীস শুনে ফেলেছে এবং দ্বীনের সমস্ত আহকাম জেনে ফেলেছে, তাই এই সুন্নাহ তাকে নতুন লেগেছে। অথচ বাস্তবপক্ষে সুন্নাহ নতুন হয় না। সুন্নাহ তো সেই চৌদ্দ শতাব্দীর পুরাতন। অবশ্য সুন্নাহর প্রচার নতুন হতে পারে। কিন্তু ঐ মিসকীন 'নতুন' বলে না জেনে তা রদ করতে চায়। অথচ তার উচিত কেবল মান্য করা এবং নিজের অজ্ঞতার উপর আক্ষেপ করা।

মোট কথা, বিদআত ও কুসংস্কারাদি দেখে আলেমের নির্বাক থাকা মোটেই উচিত নয়। হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে নিজের ইল্‌ম প্রয়োগ করা উচিত। যে জ্ঞান আল্লাহ তাকে দান করেছেন তা গোপন করা আদৌ বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩ ﴾

অর্থাৎ, আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য খোলাখুলিভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ

তাদেরকে অভিশাপ করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ করে। *(সূরা বাকারা ১৫৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, 'তোমরা উহা স্পষ্টভাবে মানুষের নিকট প্রকাশ করবে এবং উহা গোপন করবে না।' এরপরও তারা উহা পৃষ্ঠপিছে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট! *(সূরা আলে ইমরান ১৮৭ আয়াত)*

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জানা কোন ইল্ম (দ্বীনী জ্ঞান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার মুখে আগুনের লাগাম দেবেন। *(সহীহুল জামে' ৬৫১৭নং)*

(৮) বিজাতির অনুকরণ

বিজাতির অনুকরণ করেও মুসলিম নিজের পরিবেশে বিদআত সৃষ্টি করে থাকে। অমুসলিমের কর্মকে পছন্দ করে তা নিজের করণীয় ধর্ম ভেবে বসে। যেমন সাহাবী আবু ওয়াকেদ আল-লাইষী বলেন, রসূল ﷺ-এর সহিত আমরা হুনাইনের পথে বের হলাম। তখন আমরা সদ্য নও মুসলিম ছিলাম। মুশরিকদের একটি কুল গাছ ছিল; যার নিকটে ওরা ধ্যানমগ্ন হত এবং (বর্কতের আশায়) তাদের অস্ত্র-শস্ত্রকে তাতে ঝুলিয়ে রাখত; যাকে 'যা-তে আনওয়াত্' বলা হত। সুতরাং একদা আমরা এক কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। (তা দেখে) আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য একটি 'যা-তে আনওয়াত্' করে দিন যেমন ওদের রয়েছ। (তা শুনে) তিনি বললেন, 'আল্লাহু আকবার! এটাই তো পথরাজি! যার হাতে আমার জীবন আছে তাঁর কসম! তোমরা সেই কথাই বললে যে কথা বানী ইস্রাঈল মূসাকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য এক দেবতা গড়ে দিন যেমন ওদের অনেক দেবতা রয়েছে!' মূসা বলেছিলেন, 'তোমরা মূর্খ জাতি।' অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতির) পথ অনুসরণ করবে।" *(তিরমিযী ২১৮০, মুসনাদ আহমাদ*

৫/২১৮ নং)

অতএব উক্ত হাদীসে স্পষ্ট হয় যে, কাফেরদের অনুকরণই বানী ইসরাঈল এবং কিছু নও মুসলিম সহাবীকে এমন নিকৃষ্ট আবেদনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর সে আবেদন ছিল এমন মাবূদ গড়া বা নির্দিষ্ট করা যেমন কাফেরদের ছিল; যার নিকট তারা ধ্যানমগ্ন হত, বর্কতের আশায় তার উপর অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত এবং আল্লাহকে ছেড়ে তার আরাধনা করত।

বস্তুতঃ এই পরিস্থিতিই বর্তমান কালেও বিরাজমান। যেহেতু অধিকাংশ মুসলিম দলই কাফেরদের অনুকরণ করে বিদআত, শির্ক, কুসংস্কার যেমন; দর্গাপূজা, কবরের উপর পুষ্পার্ঘ-দান, জন্মদিন, বার্থ ডে, নবী দিবস পালন, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট খাদ্য ভক্ষণ, ইসলামী কোন ঐতিহাসিক দিনকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন, স্মারক দিবস উদযাপন, স্মারক মূর্তি প্রতিষ্ঠাকরণ, শোক দিবস পালন, জানাযার বিভিন্ন বিদআত রচনা, সমাধির উপর মাযার নির্মাণ প্রভৃতি কর্ম ধর্ম ও নাজাতের অসীলা ভেবে আবিষ্কার করেছে; যার কোন দলীল আল্লাহ অবতীর্ণ করেন নি।

আল্লাহর রসূল ﷺ সত্যই বলেছেন, "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত বিঘত এবং হাত হাত পরিমাণ (সম্পূর্ণরূপে)। এমনকি তারা যদি সান্ডার (গোসাপ জাতীয় একপ্রকার হালাল জন্তুর) গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর (প্রকাশ্যে) স্ত্রী-সংগম করে তবে তোমরাও তা করবে)!" সাহাবাগণ বললেন, 'আল্লাহর রসূল ইয়াহুদ ও খ্রীষ্টানরা?' তিনি বললেন "তবে আবার কারা?" *(বুখারী, মুসলিম ও হাকেম)*

আর সাহাবী হুযাইফাহ বিন আল-ইয়ামানও সঠিকই বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূববর্তী জাতির পথের অনুসরণ করবে জুতার পরিমাপের মত (পুরাপুরি খাপে-খাপে), তোমরা পথ ভুল করবে না এবং তারাও তোমাদেরকে (সঙ্গে করতে) ভুল করবে না। এমনকি তারা যদি শুষ্ক অথবা নরম পায়খানা খায় তাহলে তোমরাও তা (তাদের অনুসরণে 'নিউ ফ্যাশন' মনে করে) খাবে!' *(আল-বিদাউ অন্নাহয়্যু আনহা, ইবনে অযযাহ ৭১পৃঃ, তানবীহ উলিল আবসার ১৭২ পৃঃ)*

(৯) কাশ্‌ফ্‌ ও স্বপ্ন

এক শ্রেণীর পীর, দরবেশ, ফকীর বা সূফীদের দাবী যে, তাদের নিকট নাকি বহু বিষয়ে আল্লাহর তরফ থেকে কাশ্‌ফ হয়; যেমন আল্লাহর নবীর প্রতি অহী হতো। আবার অনেকে স্বপ্নে বা জাগ্রতাবস্থায় আল্লাহ অথবা তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করে সরাসরি দ্বীনী ও নাজাতের জ্ঞান এবং পথ অর্জন করে থাকে! আর এর হাওয়ালায় নতুন-নতুন দ্বীনী আচার-অনুষ্ঠান আবিষ্কার করে থাকে। শুধু তাই নয় বরং তারা এই নিয়ে গর্বও করে, তাদের ঐ জ্ঞান (?)কে কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, কিতাব ও সুন্নাহর আলেমের প্রতি ভ্রূকুটি হেনে বলে, 'তোমাদের সনদ (বর্ণনা সূত্র) তো এক মৃত ব্যক্তি হতে অপর এক মৃত ব্যক্তি। কিন্তু আমরা সরা-সরি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট হতে ইল্‌ম গ্রহণ করে থাকি।' তাই তাদের সনদে তারা বলে, 'আমার প্রভু হতে আমার হৃদয় আমাকে বয়ান করেছে যে, -----।'

বলে, 'তোমাদের কিতাবী ইল্‌ম, আর আমাদের কালবী ইল্‌ম; কলবে কলবে বাতেনী ইল্‌ম! মৌলভীরা তো পানারি পাতার মত পানির (ইল্‌মের) উপর ভেসে বেড়ায়, আমরা পানির (ইল্‌মে) গভীরে প্রবেশ করি ----' ইত্যাদি বুলি আওড়ে কিতাব ও সুন্নাহ ছেড়ে দ্বীনী বিধানের তৃতীয় উৎসরূপে তাদের মনের মানস কল্পনা ও ভাবাবেগকে শ্রেষ্ঠ কারামত বলে জাহির করে এবং বহু অজ্ঞ তাদের সেই কাল্পনিক কথার অনুসরণ করে নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করে অথচ তারাই সর্বনাশগ্রস্ত বিদআতী।

(১০) যয়ীফ ও জাল হাদীসের উপর ভিত্তিকরণ

অধিকাংশ বিদআতীরা দূর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে বিদআত (আমল) করে থাকে। এই ধরনের হাদীস ব্যাপকভাবে প্রচার করে থাকে। এর দ্বারা তাদের লিখিত কিতাবের কলেবরও বৃদ্ধি করে থাকে অথচ ঠিক একই সময়ে বহু সংখ্যক সহীহ হাদীসকে রদ করে থাকে। তার উপর আমল করতে অজুহাত পেশ করে বলে, 'ঐ হাদীস অসূলের খেলাফ', অথবা 'ওটা খবরে ওয়াহেদ' ইত্যাদি। আর এই ধরনের খোঁড়া ওজরে কত সুন্নত বরং ওয়াজেব ত্যাগ করে বসে।

আবার প্রতিবাদ করে যদি ওদেরকে বলা হয় যে, যে হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমল করছেন তা তো যয়ীফ অথবা মওযু'। তখন ওরা তার প্রত্যুত্তরে এমন কথা

বলে যা অর্থহীন। যেমন বলে যে, 'ফাযায়েলে আ'মালে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল চলবে' ইত্যাদি। অথচ এ কথা শর্তহীন নয়। *(দেখুনঃ তানবীহু উলিল আবসার)*

"মুহাদ্দেসীন ও অসূলিইয়্যীনদেন নিকট যথাস্থানে নির্দিষ্ট শর্তাবলীর সহিত ফাযায়েলে আমালে যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা যায়।" এই কথার উপর দুটি আপত্তিমূলক টিপ্পনী রয়েছে।

(১) এই উক্তি হতে অনেকেই 'সাধারণ' বা 'ব্যাপক' অর্থ বুঝে থাকে। মনে করে যে, উক্ত আমলে উলামাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। অথচ এ রকমটা নয় বরং তাতে বিদিত মতভেদ বর্তমান যা বিভিন্ন হাদীসের পারিভাষিক (অসূলেহাদীসের) গ্রন্থ মূহে বিশদভাবে আলোচিত। যেমন আল্লামা শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী (রঃ) তার গ্রন্থ (কাওয়ায়েদুল হাদীসে) আলোচনা করেছেন।

তিনি ১১৩ পৃষ্ঠায় ইমামগণের এক জামাআত থেকে নকল করেন যে, তাঁরা আদপে যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা ঠিক মনে করতেন না। যেমন, ইবনে মাঈন, বুখারী, মুসলিম, আবু বাকর ইবনুল আরাবী প্রভৃতিগণ। এঁদের মধ্যে ইবনে হাযম অন্যতম; তিনি তার গ্রন্থ 'আল-মিলাল অন্-নিহাল' এ বলেন, '(সেই হাদীস দ্বারা আমল সিদ্ধ হবে) যে হাদীসকে পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেরা (অর্থাৎ, বহু সংখ্যক লোক) কিংবা সকলেই সকল হতে কিংবা বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত হতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু যে হাদীসের বর্ণনা-সূত্রে কোন মিথ্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি, কিংবা কোন অমনোযোগী গাফেল ব্যক্তি কিংবা কোন পরিচয়হীন অজ্ঞাত ব্যক্তি থাকে, তাহলে সেই হাদীস (যয়ীফ হওয়া সত্ত্বেও তার) দ্বারা কতক মুসলিম বলে থাকে (আমল করে থাকে)। অবশ্য আমাদের নিকট এমন হাদীস দ্বারা কিছু বলা (বা আমল করা), তা সত্য জানা এবং তার কিছু অংশ গ্রহণ করাও অবৈধ।'

হাফেয ইবনে রজব তিরমিযীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থে (২/১১২)তে বলেন, 'ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থের ভূমিকায় যা উল্লেখ করেছেন তার প্রকাশ্য অর্থ এই বুঝায় যে, তরগীব ও তরহীবে (অনুপ্রেরণাদায়ক ও ভীতি সঞ্চারক)এর হাদীসও তার নিকট হতেই বর্ণনা করা হবে, যার নিকট হতে আহকাম (কর্মাকর্ম সম্পর্কিত)এর হাদীস বর্ণনা করা হয়। (অর্থাৎ যয়ীফ রাবী হতে যেমন আহকামের হাদীস বর্ণনা করা হয় না, তেমনিই সেই রাবী হতে তরগীব ও তরহীবের হাদীসও বর্ণনা করা হবে না।)

এ যুগে অদ্বিতীয় মুহাদ্দেস আল্লামা আলবানী হাফেযাহুল্লাহ বলেন, 'এই অভিমত ও বিশ্বাস রেখেই আমি আল্লাহর আনুগত্য করি এবং এই অভিমতের প্রতিই

মানুষকে আহবান করি যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা আদপে আমল করা যাবে না, না ফাযায়েল ও মুস্তাহাব আমলে আর না অন্য কিছুতে। কারণ, যয়ীফ হাদীস কোন বিষয়ে অনিশ্চিত ধারণা জন্মায় মাত্র (যা নিশ্চিতরূপে রসূল ﷺ-এর বাণী নাও হতে পারে।) (2) এবং আমার জানা মতে, উলামাদের নিকট এটা অবিসংবাদিত। অতএব যদি তাই হয়, তবে কিরূপে ঐ হাদীস দ্বারা আমল করার কথা বৈধ বলা যায়? অথচ আল্লাহ অজাল্লা তাঁর কিতাবে একাধিক স্থানে 'ধারণার' নিন্দাবাদ করেছেন; তিনি বলেন,

﴿ وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, ওদের এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই, ওরা অনুমানের অনুসরণ করে অথচ সত্যের বিরুদ্ধে অনুমানের (ধারণার) কোন মূল্য নেই। *(সূরা নাজ্‌ম ২৮ আয়াত)*

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা অনুমান (ধারণা) করা হতে বাঁচ। অবশ্যই অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

জেনে রাখুন যে, আমি যে রায় এখতিয়ার করেছি তার প্রতিপক্ষের নিকট এই রায়ের বিপক্ষে) কিতাব ও সুন্নাহ থেকে কোন দলীল নেই। অবশ্য পরবর্তীযুগের কোন আলেম তার গ্রন্থ 'আল-আজবিবাতুল ফাযেলাহ' তে এই মাসআলার উপর নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদে (৩৬-৫৯পৃঃ) ওঁদের সমর্থনে (ও আমাদের এই অভিমতের বিরুদ্ধে) দলীল পেশ করার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সপক্ষে অন্ততঃপক্ষে একটিও এমন দলীল উল্লেখ করতে সক্ষম হননি, যা হুজ্জতের উপযুক্ত! হ্যাঁ, তবে কিছু এমন উক্তি তাঁদের কারো কারো নিকট হতে নকল করেছেন, যেগুলি উক্ত বিতর্ক ও সমীক্ষার বাজারে অচল। এতদ্‌সত্ত্বেও ঐ সমস্ত উক্তির কিছু কিছুতে পরস্পর-বিরোধিতাও বিদ্যমান। যেমন, ৪১ পৃষ্ঠায় ইবনুল হুমাম হতে নকল করেন, "গড়া নয় এমন যয়ীফ হাদীস দ্বারা ইস্তিহবাব প্রমাণিত হবে।" অতঃপর ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় জালালুদ্দীন দাওয়ানী হতে নকল করেন, তিনি বলেছেন, এ কথা সর্বসম্মত যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা শরীয়তের 'আহকামে খামসাহ' (অর্থাৎ ওয়াজেব, মুস্তহাব, মুবাহ, মকরূহ ও হারাম) প্রমাণিত হবে না এবং ওর মধ্যে ইস্তিহবাবও।

---

(2) অনেকে বলে থাকে যে, 'কসম করে বলতে পারবে যে, যয়ীফ হাদীস রসূলের উক্তি নয়! উত্তরে বলা যায় যে, তা বলা যাবে না ঠিক। কিন্তু কসম করে এও বলতে পারা যাবে না যে, 'যয়ীফ হাদীস তাঁর উক্তি।' সুতরাং সন্দিহান বিদ্যমান, যা ত্যাগ করাই উত্তম এবং পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম।

আমি (আলবানী) বলি, এ কথাটাই সঠিক! যেহেতু অনুমান দ্বারা আমল নিষিদ্ধ এবং যয়ীফ হাদীস অনিশ্চিত অনুমান বা ধারণা সৃষ্টি করে, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।'

মোট কথা, ফাযায়েলে আ'মাল বলতে এমন আমল যার ফযীলত আছে, তা যয়ীফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে করা যাবে না। করলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে। যেহেতু যয়ীফ হাদীস দ্বারা কোন আহকাম বা আমল (অনুরূপ কোন আকীদাও) সাব্যস্ত হয় না। তবে এমন আমল যা সহীহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তার ফযীলত বর্ণনায় আমল করা যায়, তবে তারও শর্ত আছে যা পরে বলা হবে।

উদাহরণস্বরূপ, চাশ্তের নামায সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। *(মুসলিম)* কিন্তু তার ফযীলত প্রসঙ্গে এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি ঐ নামায পড়বে তার পাপ সমূদ্রের ফেনার সমান হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি নিয়মিত বারো রাকআত চাশ্তের নামায পড়ে, তার জন্য আল্লাহ পাক বেহেশ্তে এক সোনার মহল তৈরী করেন।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

আর এ দুটি হাদীসই যয়ীফ। চাশ্তের নামাযের এই ফযীলত বিশ্বাসে (ওঁদের মতে) তা ব্যবহার করা যায়।

অনুরূপভাবে কুরবানী করা ও তার মর্যাদা কুরআন ও সুন্নাহতে প্রমাণিত তার ফযীলত বর্ণনায় (ওঁদের মতে কিছু শর্তের সাথে) কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে এক একটা নেকী--।" এই হাদীস ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, 'শরীয়তে যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করা বৈধ নয়, যা সহীহ বা হাসান নয়। কিন্তু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল প্রভৃতি উলামাগণ ফাযায়েলে আ'মালে সাবেত (প্রমাণসিদ্ধ) বলে জানা না যায় এমন হাদীস বর্ণনা করাকে জায়েয বলেছেন, যদি তা (ঐ যয়ীফ হাদীস) মিথ্যা বলে জানা না যায় তবে।

অর্থাৎ, যখন জানা যাবে যে, আমল শরয়ী (সহীহ) দলীল দ্বারা বিধেয় এবং তার ফযীলতে এমন হাদীস বর্ণিত হয় যা মিথ্যা (মওযু') বলে জানা যায় না, তাহলে (হাদীসে বর্ণিত) সওয়াব সত্য হতে পারে (এই বিশ্বাস করা যায়)। কিন্তু ইমামগণের কেউই এ কথা বলেননি যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা কোন কিছুকে ওয়াজেব অথবা মুস্তাহাব করা যাবে। আর যে এ কথা বলে সে ইজমা' (সর্ববাদীসম্মতি)র বিরোধিতা

করে। তদনুরূপ, কোন শরয়ী (সহীহ) দলীল ছাড়া কোন কিছুকে হারাম করাও অবৈধ। কিন্তু যদি (কোন সহীহ হাদীস দ্বারা) তার হারাম হওয়ার কথা বিদিত হয় এবং ঐ কাজের কর্তার জন্য শাস্তি বা তিরস্কারের কথা কোন এমন (দুর্বল) হাদীসে বর্ণিত হয় - যা মিথ্যা বলে জানা না যায় - তবে তা (ঐ শাস্তির বিশ্বাসে) বর্ণনা করা বৈধ।

অনুরূপভাবে তরগীব ও তরহীবে ঐরূপ হাদীস বর্ণনা করা বৈধ হবে; যদি তা মিথ্যা (গড়া) বলে পরিচিত না হয়। কিন্তু এ কথা জানা জরুরী হবে যে, আল্লাহ এ বিষয়ে এই অজ্ঞাত-পরিচয় হাদীস ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় (সহীহ) দলীলে তরগীব বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইসরাঈলিয়াতও তরগীব ও তরহীবে বর্ণনা করা যায়; যদি তা মিথ্যা বলে বিদিত না হয় এবং যখন জানা যায় যে, ঐ বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাদের শরীয়তে আদেশ দান করেছেন অথবা নিষেধ করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র অপ্রমাণিত (অশুদ্ধ) ইসরাঈলিয়াত দ্বারা আমাদের শরীয়ত প্রমাণ করা হবে -এ কথা কোন আলেম বলেন না। বরং ইমামগণ এই ধরণের কোন হাদীসকেই শরীয়তের বুনিয়াদ করেন না। আহমাদ বিন হাম্বল এবং তার মত কোন ইমামই শরীয়তে ঐ ধরনের হাদীসের উপর নির্ভর (ভিত্তি) করতেন না। যে ব্যক্তি নকল করে যে, আহমাদ যয়ীফ হাদীসকে হুজ্জত (বা দলীল) করতেন; যে হাদীস সহীহ বা হাসান নয়, তবে নিশ্চয় সে তাঁর সম্পর্কে ভুল বলে।' *(আল কায়েদাতুল জালীয়াহ ৮২ পৃঃ, মজমুআ ফাতাওয়া ১/২৫১ নং)*

আল্লামা আহমাদ শাকের 'আল-বায়েযুল হাষীষ' গ্রন্থে (১০১ পৃষ্ঠায়) বলেন, 'আহমাদ বিন হাম্বল, আব্দুর রাহমান বিন মাহদী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রঃ) এর উক্তি, 'যখন আমরা হালাল ও হারামে (আহকামে) হাদীস বর্ণনা করি, তখন কড়াকড়ি করি এবং যখন ফাযায়েল ইত্যাদিতে বর্ণনা করি তখন শৈথিল্য করি--।'

আমার মতে -অল্লাহ আ'লাম- তাঁদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, শৈথিল্য কেবল হাসান হাদীস গ্রহণে করতেন যা 'সহীহ' এর দর্জায় পৌঁছে না। কারণ সহীহ ও হাসানের মাঝে পার্থক্যরূপ পরিভাষা তাঁদের যুগে স্পষ্ট স্থিত ছিল না। বরং অধিকাংশ পূর্ববর্তীগণ হাদীসকে কেবল সহীহ অথবা যয়ীফ (এই দুই প্রকার) বলেই মনে করতেন।

সুতরাং তাঁদের ঐ শৈথিল্য যয়ীফ হাদীস বর্ণনায় নয়, হাসান হাদীস বর্ণনায়।)

আল্লামা আলবানী বলেন, 'আমার নিকট এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা রয়েছে, তাদের ঐ উল্লেখিত শৈথিল্য ইসনাদ (বর্ণনা সূত্র)সহ যয়ীফ হাদীস রেওয়ায়াত করার উপর

মানা যায় - যেমন তাদের বর্ণনার ধারা ও প্রকৃতি; যে ইসনাদ সমূহের মাধ্যমে হাদীসের দুর্বলতা জানা সম্ভব হয়। সুতরাং কেবলমাত্র সনদ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হয় এবং 'যয়ীফ' বলে বিবৃত করার প্রয়োজন আর থাকে না। কিন্তু ঐ ধরণের হাদীস বিনা সনদে বর্ণনা করা -যেমন পরবর্তীকালে উলামাগণের ধারা ও প্রকৃতি এবং তার দুর্বলতা বর্ণনা না করা -যেমন ওঁদের অধিকাংশের রীতি - এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে তাঁরা (ইমাম আহমাদ প্রভৃতিগণ) বহু ঊর্ধ্বে এবং এ বিষয়ে তাঁরা আল্লাহকে অধিক ভয় করতেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন।'

(২) যে ব্যক্তি এ ধরণের কোন গ্রন্থ লিখেন যাতে চোখ বুজে সহীহ-যয়ীফ সবই সংকলন করেন এবং মনে করেন যে, কিছু শর্তের সাথে যয়ীফ হাদীস দ্বারা ফাযায়েলে আ'মালে আমল করা যায় তাঁর উচিত, গ্রন্থের ভূমিকায় সে বিষয়ে (সাধারণকে) সতর্ক করা এবং ঐ শর্তাবলী উল্লেখ করে (সেই অনুযায়ী) আমল করতে সাবধান করা। যাতে পাঠকও অজান্তে গ্রন্থে উল্লেখিত প্রত্যেক হাদীসের উপর আমল এবং মুবাল্লেগও ঐ গ্রন্থ শুনিয়ে সকলকে আমল করার তাকীদ না করে বসে। ফলে সকলের অজান্তেই সকলে রসূলের বিরোধিতায় আলিপ্ত না হয়ে পড়ে।

সুতরাং ঐ শর্তগুলিকে জানা একান্ত জরুরী; বিশেষ করে তাদের জন্য যারা ফাযায়েলে যয়ীফকে ব্যবহার করে থাকে। যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট জানার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট জানার পর জীবিত থাকে।

হাফেয সাখাবী 'আল-কওলুল বাদী' (১৯৫ পৃঃ)তে তার ওস্তাদ হাফেয ইবনে হাজার থেকে ঐ শর্তগুলি নকল করেছেন এবং তা নিম্নরূপ ঃ-

(ক) হাদীস যেন খুব বেশী যয়ীফ না হয়। অথবা তার বর্ণনা সূত্রে যেন কোন মিথ্যাবাদী, মিথ্যায় কলঙ্কিত বা অভিযুক্ত এবং মারাত্মক ত্রুটি করে এমন ব্যক্তি না থাকে।

(খ) তা যেন (শরীয়তের) 'সাধারণ ভিত্তির' অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ একেবারে ভিত্তিহীন গড়া বা জাল হাদীস না হয়।

(গ) এ হাদীস দ্বারা আমল করার সময় যেন তা প্রমাণিত (বা শুদ্ধ) হাদীস বলে বিশ্বাস না রাখা হয়। যাতে নবী ﷺ-এর সহিত সেই সম্পর্ক না জোড়া হয়; যা তিনি বলেননি।

অতঃপর তিনি বলেন শেষোক্ত শর্ত দুটি ইবনে আব্দুস সালাম ও ইবনে দাক্বীক্বুল

ঈদ হতে বর্ণিত এবং প্রথমোক্তের জন্য আলাঈ বলেন, 'তা সর্ববাদিসম্মত।'

ইবনে হাজার (রঃ) তাঁর পুস্তিকা 'তাবয়ীনুল আজব' এ বলেন, 'আহলে ইল্‌মগণ ফাযায়েলে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন; যদি তা গড়া না হয় বা খুব বেশী যয়ীফ না হয় -এ কথাটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু এর সহিত এই শর্তও আরোপ করা উচিত যে, আমলকারী যেন ঐ হাদীসটিকে যয়ীফ বলেই বিশ্বাস রাখে (শুদ্ধ মনে না করে) এবং তা যেন প্রচার না করে। যাতে কেউ যেন যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করে যা শরীয়ত নয় তাকে শরীয়ত করে না বসে অথবা কোন জাহেল তাকে আমল করতে দেখে তা সহীহ সুন্নাত মনে না করে বসে।

এ বিষয়ে আবু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুস সালাম প্রভৃতি উলামাগণ বিবৃতি দিয়েছেন। যাতে মানুষ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সেই বাণীর পর্যায়ভুক্ত না হয়ে পড়ে যাতে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন এমন হাদীস বর্ণনা করে যার বিষয়ে সে মনে করে যে তা মিথ্যা, তাহলে সে (বর্ণনাকারী) মিথ্যাবাদীদের একজন।" *(মুসলিম, সহীহুল জামে' ৬১৯৯নং)*

সুতরাং যে আমল করবে তার অবস্থা কি? আহকাম অথবা ফাযায়েলে (যয়ীফ) হাদীস দ্বারা আমল করায় কোন পার্থক্য নেই। (অর্থাৎ যদি যয়ীফ হাদীস দ্বারা আহকাম বা হালাল ও হারামে আমল না চলে তবে ফাযায়েলেও চলবে না।) কারণ, (উভয়ের) সবটাই শরীয়ত।'

আল্লামা আলবানী (রঃ) বলেন, 'এই সমস্ত শর্তাবলী খুবই সুক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ। যদি যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমলকারীরা এর অনুগামী হয়, তাহলে তার ফল এই হবে যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমলের সীমা সংকীর্ণ হবে অথবা মূলেই আমল প্রতিহত হবে। এর বিররণ তিনভাবে দেওয়া যায়ঃ-

প্রথমতঃ প্রথম শর্তটি নির্দেশ করে যে, যে হাদীসকে ভিত্তি করে আমল করার ইচ্ছা হবে সেই হাদীসটির প্রকৃত অবস্থা জানা ওয়াজেব। যাতে বেশী যয়ীফ হলে তার দ্বারা আমল করা থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রত্যেক হাদীসের উপর এই জ্ঞান লাভ জনসাধারণের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। যেহেতু হাদীসশাস্ত্রবিদ উলামার সংখ্যা নেহাতই কম, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। অর্থাৎ, (সেই উলামার সংখ্যা নগণ্য যাঁরা তথ্যানুসন্ধানকারী (সমস্ত হাদীসের সত্যাসত্য যাচাইকারী) গবেষণা ও সমীক্ষাকারী হাদীস বিশারদ, যাঁরা রসূল ﷺ হতে শুদ্ধ প্রতিপাদিত হাদীস ব্যতীত লোকদের জন্য অন্য কোন হাদীস পরিবেশন ও বর্ণনা করেন না এবং যয়ীফ (তথা

তার নিম্নমানের) হাদীসের উপর সকলকে সতর্ক ও সাবধান করে থাকেন। বরং এই গ্রুপের উলামা অল্পের চেয়ে কম। সুতরাং আল্লাহই সাহায্যস্থল।

এরই কারণে দেখেবেন, যারা হাদীস দ্বারা আমলে আপদগ্রস্ত হয়েছে তারা এই শর্তের স্পষ্ট বিরোধিতা করে। তাদের কেউ যদিও বা সে অহাদীসের আলেম হয় - ফাযায়েলে আ'মালে কোন হাদীস জানা মাত্রই তা অধিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত কিনা তা না জেনেই তার উপর আমল করায় ত্বরান্বিত হয়। এরপর যদি কেউ তাকে ঐ হাদীসের দুর্বলতার উপর সতর্ক করে, তবে শীঘ্র ঐ তথাকথিত 'কায়দার' শরণাপন্ন হয়; "ফাযায়েলে আ'মালে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করা যায়।" পুনশ্চ যখন এই শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে যায়।'

এ বিষয়ে আল্লামা দুটি উদাহরণ পেশ করেন ঃ

(১) "সর্বোৎকৃষ্ট দিন আরাফার দিন; যদি জুমআর দিনের মুতাবেক হয় তবে তা সত্তর হজ্জ অপেক্ষা উত্তম।" (রাযীন)

এ হাদীসটির প্রসঙ্গে আল্লামা শায়খ আলী আল-ক্বারী বলেন, 'কিছু মুহাদ্দেসীন বলেন যে, এই হাদীসের ইসনাদটি যয়ীফ, তা সঠিক মানা গেলেও উদ্দেশ্যে কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু যয়ীফ হাদীস ফাযায়েলে আ'মালে গ্রহণীয় এবং আল্লামা আবুল হাসানাত লখনবী এই কথা নকল করে বহাল করেছেন। *(আল আজবিবাতুল ফাযেলাহ ৩৭ পৃঃ)*

কিন্তু ভাবার বিষয় যে, কিরূপে এই শ্রদ্ধাভাজন আলেমদ্বয় উপর্যুক্ত শর্ত লংঘন করেছেন। অথবা নিশ্চয় তাঁরা এই হাদীসের সনদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। থাকলে অবশ্যই তা বিবৃত করেতন এবং তার পরিবর্তে বিতর্ক ছলে 'তা মানা গেলেও' এই কথা বলতেন না। অথচ আল্লামা ইবনুল কাইয়েম ঐ হাদীস প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন, 'বাতিল, রসূলুল্লাহ ﷺ হতে ওর কোন ভিত্তি নেই, আর না কোন সাহাবী বা তাবেয়ী হতে।' *(যাদুল মাআদ ১/১৭)*

(২) "যখন তোমরা হাদীস লিখবে, তখন তোমরা তার সনদ সহ লিখ। যদি তা সত্য হয়, তাহলে তোমরা সওয়াবের অংশীদার হবে। আর যদি তা বাতিল হয়, তাহলে তার পাপ তার (বর্ণনাকারীর) হবে।' *(আল আজবিবাতুল ফাযেলাহ ঃ ২৬পৃঃ)*

এই হাদীসটি মওযু' (গড়া হাদীস)। *(দেখুন ঃ সিলসিলাতু আহাদীসিয যয়ীফাহ অল মওযুআহ ৮২২নং)* এতদসত্ত্বেও শ্রদ্ধেয় লখনবী সাহেব এর উপর চুপ থেকেছেন। কারণ, এটাও ফাযায়েলে আ'মাল তাই! অথচ এটি এমন একটি হাদীস যা যয়ীফ ও

জাল হাদীস প্রচার করতে ও তার উপর আমল করতে সকলকে অনুপ্রাণিত করে। যার মর্মার্থ হচ্ছে নকলকারীর কোন পাপ নেই। অথচ এমন ধারণা আহলে ইল্‌মদের নীতির পরিপন্থী। যেহেতু তাঁদের নীতি এই যে, গড়ার কথা বিবৃত না করে কোন গড়া হাদীস বর্ণনা করাই জায়েয নয়। তদনুরূপ যথার্থতা যাচাইকারী সংস্কারক উলামা; যেমন ইবনে হিব্বান প্রভৃতিগণের নিকট যয়ীফ হাদীসও (তার দুর্বলতা উল্লেখ না করে বর্ণনা বৈধ নয়)।

আল্লামা আহমাদ শাকের উপর্যুক্ত তিনটি শর্তাবলী উল্লেখ করা সর্বাবস্থায় ওয়াজেব। কারণ, তা উল্লেখ না করলে পাঠক অথবা শ্রোতার ধারণা হয় যে, তা সহীহ বিশেষ করে, নকলকারী অথবা বর্ণনাকারী যদি উলামায়ে হাদীসের মধ্যে কেউ হন (অথবা দ্বীনের বুযুর্গ হন ও সমাজে মান্য হন); যাঁর প্রতি সকলে হাদীস বিষয়ে রুজু করে। যেহেতু যয়ীফ হাদীস গ্রহণ না করায় আহকামে ও ফাযায়েলে আ'মাল ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং সহীহ বা হাসান - যা রসূল ﷺ থেকে শুদ্ধরূপে প্রমাণিত হয়েছে - তা ব্যতীত কোন কিছুতে কারো হুজ্জত বা দলীল নেই।' *(মুখতাসার আল-বায়েযুল হাষীষ ১০১পৃঃ)*

আল্লামা আলবানী বলেন, 'সার কথা এই যে, এই শর্তের পালন কার্যতঃ যে হাদীস (শুদ্ধ বা সহীহ বলে) প্রতিপাদিত নয়, সেই হাদীস দ্বারা আমল ত্যাগ করতে বাধ্য করে। কারণ, সাধারণ মানুষের পক্ষে (যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসের) 'অধিক দুর্বলতা জানা (ও চিহ্নিত করা) কঠিন। ফলতঃ এই শর্তারোপ করার অর্থ ও উদ্দেশ্যের সহিত যা আমরা এখতিয়ার করেছি তার প্রায় মিল রয়েছে এবং সেটাই উদ্দিষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় শর্ত থেকে একথাই বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে আমল যয়ীফ হাদীস দ্বারা নয়, বরং 'সাধারণ ভিত্তি' না থাকলে (কুরআন বা সহীহ সুন্নাহ হতে ঐ আমলের মূল বুনিয়াদ না থাকলে) যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল হয় না। অতএব এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এই শর্তের সহিত যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা আপাতদৃষ্ট, বস্তুতঃ নয়। আর সেটাই অভীষ্ট।

তৃতীয়তঃ তৃতীয় শর্তটি হাদীসের দুর্বলতা জানা জরুরী হওয়ার ব্যাপারে প্রথম শর্তেরই অনুরূপ। যাতে আমলকারী তা (সহীহ) প্রমাণিত বলে বিশ্বাস না করে বসে। অথচ বিদিত যে, যারা ফাযায়েলে যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে আমল করে তাদের অধিকাংশই হাদীসের দুর্বলতা চেনে না। আর এটা উদ্দেশ্যের বিপরীত।

পরিশেষে স্থূল কথা এই যে, আমরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুসলিম জন সাধারণকে উপদেশ করি যে, তাঁরা যেন যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা আদপেই ত্যাগ করেন এবং নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত (সহীহ বা হাসান) হাদীস দ্বারা আমল করতে উদ্যোগী হন। যেহেতু তাতেই যা আছে যয়ীফ হাদীস থেকে অমুখাপেক্ষী করে। (আমলের জন্য তাই যথেষ্ট।) আর ওটাই রসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যা বলায় আপতিত হওয়া (ও নিজের ঠিকানা জাহান্নাম করে নেওয়া) থেকে বাঁচার পথ। কারণ, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় জানি যে, যারা এ বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করে তারা উক্ত মিথ্যাবাদিতায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। যেহেতু তারা প্রত্যেক সবল-দুর্বল (এবং জাল ও গড়া) হাদীস (এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কেচ্ছা-কাহিনীকে হাদীস ধারণা করে তার দ্বারা) আমল করে থাকে। অথচ নবী ﷺ (এর প্রতি ইঙ্গিত করে) বলেন, "মানুষের মিথ্যাবাদিতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (অনুরূপভাবে যা পড়ে) তার সবটাই বর্ণনা করে।" *(মুসলিম)*

আর এর উপরেই বলি মানুষের ভ্রষ্টতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (বা পড়ে) তার সবটার উপরই (বিচার-বিবেক না করে) আমল করে। (যেহেতু চকচক করলেই সোনা হয় না।) *(দ্রষ্টব্যঃ সহীহহুল জামেইস সাগীর, ভূমিকা ৪৯-৫৬পৃঃ, তামামুল মিন্নাহ, ভূমিকা)*

বিদআত ও বিদআতীর পরিণাম

(১) বিদআত কুফরের ডাকঘর। বিদআতীদের বহু ফির্কা তাদের বিদআতের মাধ্যমে কুফরে পৌঁছে কাফের হয়ে গেছে; যদিও বা তারা নিজেদের পরিচয় মুসলিম বলেই দিয়ে থাকে। যেমন 'কামেল পীর বা দরবেশ'দের উপর থেকে শরয়ী বন্ধন তুলে নেওয়া, তাদেরকে আল্লাহর কিছু বৈশিষ্ট্যে (যেমন, গায়েব জানা, মসীবত দূর করা, সন্তান দান করা প্রভৃতির ব্যাপারে) শরীক করা, তাদের কবর সিজদা করা, বা তওয়াফ করা। কাবীরাহ গোনাহকারী মুসলিমকে কাফের জ্ঞান করা ইত্যাদি।

যারা কিছু আমল ও ইবাদত তো করে কিন্তু ঐরূপ বিদআতের পাশে কোনই মূল্য নেই। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡـٔٗا ﴾

অর্থাৎ, যারা কুফরী করে (সত্য প্রত্যাখ্যান করে) তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার

ন্যায়, পিপাসার্থ যাকে পানি মনে করে; কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখে তা কিছুই নয়। *(সূরা নূর ৩৯ আয়াত)*

(২) বিদআতীরা আল্লাহর উপর বিনা ইলমে অনুমান-প্রসূত কথা বলে। সাধারণতঃ বাতেনী দাবীদাররা এই রোগের রোগী। যারা কলবে জ্ঞানার্জন করে থাকে, কুরআন হাদীস ও তফসীরের ইলমে কোন প্রকারের অনুরাগ প্রকাশ করে না, সলফের পথ জানার কোন ইচ্ছা রাখে না। বরং মনগড়া বাতেনী ইল্ম দ্বারা স্বপ্ন ও পরিকল্পিত কাশ্ফ দ্বারা এবং ত্রিশ এর অধিক পারা কুরআন (?) দ্বারা ভক্তদের মনোরঞ্জন করে থাকে। শরীয়তের ঊর্ধ্বে থেকে মারেফতীর দাবী করে সবকাজে ফূর্তি মারে। আর এ সবের মাধ্যমে প্রকৃত ইল্ম ছাড়াই আল্লাহ ও তদীয় রসূলের উপর হলাহল মিথ্যা বলে। যা বান্দার জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। *(সূরা আ'রাফ ৩৩ আয়াত)*

মহান আল্লাহ নিজ নবীর জন্য বলেন,

﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, সে যদি কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, তবে আমি তাকে কঠোর হস্তে দমন করতাম এবং তার কণ্ঠশিরা কেটে দিতাম, তখন তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারত না। *(সূরা হাক্কাহ ৪৪-৪৯ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যা বলে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অনুরূপভাবে শির্ক ও কুফরীর মূলও আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা। যেহেতু মুশরিক অজ্ঞভাবেই মনে করে যে, সে যার পূজা করে সেই মা'বূদ তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে, তাঁর সামীপ্য দান করবে, তাঁর নিকট সুপারিশ করবে এবং অসীলা বা মাধ্যম হয়ে তাঁর নিকট থেকে তার প্রয়োজন মিটাবে। এ সব অমূলক ধারণা তার কল্পনা-প্রসূত। তাই প্রত্যেক মুশরিক আল্লাহর উপর মিথ্যা ধারণা ও রচনা করে থাকে। আর এইরূপ ধারণা ও অনুমানই বিদআতীকে বিদআতে উৎসাহিত করে। *(মাদারেজুস সালেকীন)*

আর "যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে?" *(সূরা আ'রাফ ৩৭ আয়াত)*

(৩) বিদআতীরা সুন্নাহ ও আহলে সুন্নাহর প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ

করে। উল্টোভাবে নিজেদেরকে 'আহলে সুন্নাহ' এবং প্রকৃত আহলে সুন্নাহকে 'কাফের', 'ওয়াহাবী' ইত্যাদি বলে। 'অন্ধকার বলে, আলো তুমি নহ ভালো!'

বিদআতীরা আহলে সুন্নাহকে বিভিন্নভাবে অপবাদ দিয়ে মন্দ নামে অভিহিত করেছে। যেমন মক্কার মুশরেকীনরা প্রিয় নবী ﷺ-কে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে কেউ বলেছিল, 'যাদুকর', কেউ বলেছিল, 'গণক', কেউ বলেছিল, 'কবি', কেউ বলেছিল 'পাগল', কেউ বলেছিল 'বিকার গ্রস্ত', আবার কেউ বলেছিল, 'মিথ্যারচনাকারী মিথ্যুক' ইত্যাদি। অথচ তিনি এ সব অপবাদ থেকে পবিত্র ছিলেন।

আল্লাহ বলেছিলেন,

﴿ ٱنظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلۡأَمۡثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ سَبِيلٗا ﴾

অর্থাৎ, দেখ ওরা তোমার জন্য কি উপমা দেয় ফলে ওরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং ওরা পথ পাবে না। *(সূরা ইসরা ৪৮ আয়াত)*

তদনুরূপ আহলে সুন্নাহ বা সালাফীগণও যাবতীয় অপবাদ থেকে পবিত্র। যেহেতু তারা উজ্জ্বল সুন্নাহ, সন্তোষভাজন চরিত্র, সরল পথ এবং শক্ত, চূড়ান্ত ও অকাট্য দলীলের ধারক ও বাহক। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ যাদেরকে তাঁর কিতাব ও অহী-বাণীর অনুসরণ এবং তাঁর রসূলের চরিতাদর্শের অনুকরণ করার তওফীক ও প্রেরণা দান করেছেন। যারা তাঁর অনুকরণে মানুষকে সৎকথা ও কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কথা ও কাজে বাধা দান করে থাকে এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁরই চরিত ও সুন্নাহর অনুসারী থাকে। যাদের বক্ষ তাঁর প্রেমে এবং তাঁর শরীয়তের ইমামগণ ও তাঁর উম্মতের উলামাগণের মহব্বতে সদা প্রশস্ত। আর যারা যে জাতিকে ভালোবাসে তারা কিয়ামতে তাদেরই সঙ্গী হবে। *(ই'তিকাদু আহলিল হাদীস)*

(৪) পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, বিআতীদের আমল রহিত, যেহেতু দ্বীন পূর্ণাঙ্গ এবং যে কাজে কিতাব বা সুন্নাহর কোন নির্দেশ নেই তা করা ভ্রষ্টতা এবং এর পরিণাম জাহান্নাম। বিদআতীদের নিরর্থক মেহনত এবং বেকার কর্মকান্ডের কোন পারিশ্রমিক, প্রতিদান ও সুফল নেই। আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন,

﴿ قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُم بِٱلۡأَخۡسَرِينَ أَعۡمَٰلًا ۝ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ۝ ﴾

অর্থাৎ, বল আমি কি তোমাদেরকে তাদের সংবাদ দেব, যারা কর্মে (আমলে) বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা

মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। *(সূরা কাহফ ১০৩-১০৪ আয়াত)*

(৫) বিদআতীদের সমঝ বিপরীত মুখী হয়ে যায়। জলাতঙ্ক রোগের মত কুপ্রবৃত্তি তাদের শিরা-উপশিরায় স্থানাধিকার করে বসে। ফলে ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো রূপে দেখে থাকে। বিদআতকে সুন্নাত এবং সুন্নাতকে বিদআত জ্ঞান করে থাকে। বিদআতীকে ওলী এবং সুন্নীকে 'কাফের' ভেবে থাকে। বাউলিয়াকে আওলিয়া এবং মুত্তাকীন আওলিয়াকে (ইলমের) দেউলিয়া মনে করে। যাদের নিকট কোন হুজ্জত ও দলীল ফলপ্রসূ হয় না। নবীর আদেশ মানতে এবং প্রকৃত আওলিয়াদের ও দলীল পথ অনুসরণ করতে বললে বলে, 'তোমাদের নবী ও আওলিয়াদের পথ অনুসরণ করতে বললে বলে, 'তোমাদের নবী ও আওলিয়াদের প্রতি কোন আদব ও মহব্বতক নেই।' হাদীস ও আয়াত দ্বারা কুরআনের তফসীর করতে গেলে বলে, 'তোমরা কুরআন বুঝ না, কুরআন মান না।' প্রায় সব ব্যাপারেই 'উল্টা বুঝিল রাম।'

(৬) যে বিদআত করলে মানুষ কাফের হয়ে যায় সেই বিদআতের বিদআতী এবং তার প্রতি আহবানকারী বিদআতীর রেওয়ায়াত (হাদীসের বর্ণনা) গ্রহণ যোগ্য নয়। যেমন, তার সাক্ষিও অগ্রহণযোগ্য।

(৭) অধিকাংশ ফিতনার পশ্চাতে কোন না কোন বিদআতীর হাত থাকে এবং বিদআতীরাই বেশীরভাগ ফিতনায় আপতিত হয়ে থাকে। তাদের কারণে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এমন ফিতনার সৃষ্টি হয় যাতে বহু মানুষ সন্ধ্যায় মুমিন থাকে, সকালে কাফের হয়ে যায় এবং সকালে মুমিন থাকলে, সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যায়। সামান্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে এরা দ্বীনকে বিক্রয় করে দেয়।

বিদআতই দ্বীন ও সমাজের বড় ফিতনা। ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে, যখন ফিতনা তোমাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেবে? যাতে বড় বৃদ্ধ হবে এবং ছোট প্রতিপালিত (হয়ে বড়) হবে। মানুষ যাকে সুন্নাহ মনে করবে। যখন তা (ফিতনা বা বিদআত) অপসারিত করা হবে তখন লোকেরা বলবে, 'সুন্নাত অপসারিত হল।' একজন জিজ্ঞাসা করল, 'হে আবু আব্দুর রহমান! এরূপ কখন হবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের ক্বারীর সংখ্যা অধিক হবে এবং ফকীহ (অভিজ্ঞ আলেমদের) সংখ্যা কম হবে, তোমাদের নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আমানতদারের সংখ্যা কমে যাবে ও আখেরাতের কর্ম দ্বারা দুনিয়ার সম্পদ অন্বেষণ করা হবে।" *(দারেমী ১/৬৪ নং)*

ইমাম মালেকের নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আবু আব্দুল্লাহ! কোত্থেকে ইহরাম বাঁধব?' তিনি বললেন, 'যুলহুলাইফা থেকে; যেখান থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম বেঁধে ছিলেন।' লোকটি বলল, 'আমি মসজিদে (নববী) থেকে ইহরাম বাঁধতে ইচ্ছা করছি।' তিনি বললেন, 'এমনটি করো না।' লোকটি বলল, 'আমি ইচ্ছা করছি যে, মসজিদে কবরের নিকট থেকে এহরাম বাঁধব।' তিনি বললেন, 'এমনটি করো না; কারণ আমি তোমার উপর ফিতনার ভয় করি।' লোকটি বলল, 'এটা আবার কোন ফিতনা? এতো কয়েকটা মাইল মাত্র বেশী করব!' তিনি বললেন, 'কোন ফিতনা এর চেয়ে অধিক বড় যে, তুমি মনে কর, তুমি এমন ফযীলতের প্রতি অগ্রগামী হয়েছ, যা হতে রসূল ﷺ পিছে থেকে গেছেন? আমি শুনেছি আল্লাহ বলেছেন যে,

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় (ফিতনা) অথবা কঠিন শাস্তি (আযাব) তাদেরকে গ্রাস করবে। *(সূরা নূর ৬৩)*

বলাই বাহুল্য যে, বিদআতীদের এটাই হচ্ছে মূল বুনিয়াদ। 'ভাল জিনিস তো। বাড়তি করলে ক্ষতি কি?' তাদের আকেলে অনুরূপ অতিরঞ্জনে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, ঐটাই ফিতনা।

(৮) বিদআতীর নিকট হক ও বাতিলের মাঝে তালগোল খেয়ে যায়। কখনো বা মস্তবড় গর্হিত কর্ম দেখে চুপ থেকে মৌনসম্মতি জানায়। আবার কখনো ছোট বিষয়ে কোমর বেঁধে লড়ে। কখনো সামান্য বিষয়কে বড় এবং বড় বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তাই কখনো মুসলিমদের জান ও মালকে হালাল মনে করে তাদেরকে হত্যা করে। এবং কখনো মশা মারাও হারাম ভাবে। বিভিন্ন কুসংস্কারদিকে দ্বীন ভাবে। যাদু ও শয়তানী কর্মকান্ডকে কারামত জ্ঞান করে। ফলে তাদের অবস্থা ঠিক বানী ইস্রাঈলদের মত হয়; যাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না। *(সূরা বাক্বারাহ ৪২ আয়াত)*

(৯) বিদআতী অভিশাপ যোগ্য। তদনুরূপ যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করে তার উপরেও আল্লাহ ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সকল মানুষের

অভিশাপ।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মদীনায় ঈর থেকে সওর পর্যন্ত হারাম। যে ব্যক্তি তার মধ্যে কোন অপকর্ম করবে বা দুর্ঘটনা ঘটাবে বা নবরচিত কর্ম (বিদআত) করবে অথবা এমন অপকর্মকারী বা বিদআতীকে স্থান বা প্রশ্রয় দেবে বা সাহায্য করবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার নিকট হতে ফরয ও নফল কোন কিছুই গ্রহণ করবেন না।" *(বুখারী, মুসলিম ১৩৬৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে নিজ পিতামাতাকে অভিসম্পাত করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে কোন দুষ্কৃতকারী বা বিদআতীকে আশ্রয় দেয় এবং আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে ভূমির (জমি-জায়গার) সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন করে।" *(মুসলিম ১৯৭৮)*

(১০) বিদআতী আল্লাহর যিক্র হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে। আবার যিক্র করলেও মনগড়া রচিত যিক্র মুখে আওড়ে থাকে। 'ইল-ইল, হু-হু, হাই-হাই' প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ দ্বারা উচ্চস্বরে আজব যিক্র টেনে থাকে। বরং এখানেই শেষ নয়; যিক্রের সময় তথাকথিত তন্ময়তা ও ভাবাবেগে তারা নিজেদের দেহ আন্দোলিত করে। কাওয়ালীর সুরে ও ডুগডুগির তালে নাচতে থাকে। বরং নারী -পুরুষ একই কক্ষে এই যিক্র হেঁকে থাকে। কখনো বা হুযুরের তরফ থেকে এই প্রত্যাদেশ হয়, 'মনের আলো বড় আলো বাইরের আলো নিভাও রে, মনের পর্দা বড় পর্দা বাইরের পর্দা উঠাও রে!' অতঃপর ঐ কামেলের মজলিসে অন্ধকারে বেপর্দায় যা ঘটে, তা বলাই বাহুল্য! অবশ্য এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, ঐ কামেলদের উপর শরীয়তের কোন বাঁধনই অবশিষ্ট থাকে না!!

পক্ষান্তরে অনেক বিদআতীর নিকট তাদের মনগড়া যিক্র আওড়ানো কুরআন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত যিকর তো জানেই না। বলতে গেলে ব্যঙ্গ হাসে অথবা মুখ টেরা করে নেয়। যেহেতু ওদের নিকট 'কিতাবী' যিক্র অপেক্ষা 'কলবী' যিক্রে ফযীলত বেশী। তাই কুরআন পঠিত হলে কর্ণপাত করে না অথচ ঐ ধরণের যিকর অথবা কাওয়ালী যিক্রের ক্ষেত্রে মন দিয়ে কান লাগিয়ে মাথা হিলিয়ে শোনে ও আওড়ায়। মহান আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলেন,

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا

هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾

অর্থাৎ, যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না (তাদের সামনে) যখন একক আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো (তাদের উপাস্যদের) উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়।" *(সূরা যুমার ৪৫ আয়াত)*

এরা তো সেই বিদআতী যারা কুরআন ও সুন্নাহর নাম শুনলে স্থান ত্যাগ করার চেষ্টা করে। কুরআন-হাদীস শুনতে এদের মন টক হয়ে যায়। কুরআন ও সুন্নাহর মজলিস ও জলসায় উপস্থিত হয় না। হলেও তাদের প্রবৃত্তির প্রতিকূল কথা শুনে মজলিস ছেড়ে পলায়ন করতে চায়। মহান আল্লাহ ঐ শ্রেণীর মানুষের জন্য বলেন,

﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ ﴾

অর্থাৎ, ওদের কি হয়েছে যে, ওরা উপদেশ হতে দূরে সরে পড়ে? ওরা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভদল, যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়ন-পর। *(সূরা মুদ্দাষ্‌ষির ৪৯-৫১ আয়াত)*

পরন্তু এমন অনেক বিদআতী আছে, যারা উচ্চ ও সমস্বরে কখনো বা লাউড স্পিকারে যিক্‌র হাঁকে। এরা একই সঙ্গে বিদআত করে, রিয়া করে, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় এবং আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি মানুষের মনকে বীতরাগ করে তোলে। আবার তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলামকে কেবল যিক্‌র ও খানকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় এবং অন্যান্য ময়দান ও পরিবেশে তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না!

(১১) বিদআতীদের প্রধান চরিত্রসমূহের অন্যতম চরিত্র সত্য গোপন করা। আপন ভক্তদের নিকট কত ন্যায় ও সত্যের অপলাপ ঘটায়, যা প্রকাশ করলে তাদের ভেদ ফাঁস হয়ে যায়। কোন স্বার্থের খাতিরে জানা বিষয়কে না জানার ভান করে অথবা শব্দার্থ গোপন করে অথবা কূটার্থ বা দূর ব্যাখ্যা করে অথবা মনগড়া অর্থ করে আসল সত্য গোপন করে। আর এই কাজে তারা ঐ কাফেরদের দলে শামিল হয়ে যায়, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (মুহাম্মাদ)কেও তেমনি চেনে, যেমন তারা তাদের পুত্রদেরকে চেনে। কিন্তু তাদের একদল জেনেশুনে সত্য

গোপন করে থাকে।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা কি আশা কর যে, ওরা তোমাদের মত ঈমান আনবে? অথচ ওদের মধ্যে একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত এবং বুঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত।" *(সূরা বাক্বারাহ ৭৫ আয়াত)*

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য খোলাখুলিভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৯ আয়াত)*

আর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন জানা ইল্‌ম প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয় এবং তা গোপন করে, আল্লাহ কিয়ামতে তার মুখে আগুনের লাগাম দেবেন।" *(ইবনে মাজাহ)*

বলাই বাহুল্য যে, কোন ইল্‌ম গোপন করা মুসলিমের জন্য হারাম এবং তার শাস্তি ভয়ানক। অতএব কোন মুত্তাকী ওলী কি করে কি সাহসে কোন ইল্‌ম গুপ্ত রাখতে পারেন? যাতে এ কথাই প্রতয়ীমান হয় যে, কোনও ইল্‌ম -যার মাধ্যমে ইহ-পরকালে মঙ্গলের আশা করা যায়-তা গুপ্ত নেই। সব ইল্‌মই আল-আমীন নবী ﷺ, তাঁর পর তাঁর আমানতদার সাহাবায়ে কেরাম ﷽, তাঁদের পর তাবেয়ীনবৃন্দ (রঃ) এবং তাঁদেরই অনুগামী আউলিয়া ও ইমামগণ প্রকাশ ও প্রচার করে গেছেন। বাতেনী ইল্‌ম বলে কিছু নেই; যা আছে তা ভন্ডামি ও ভ্রষ্টতা। বাতেনীর নাম নিয়ে বোকা মানুষদেরকে ধোকায় ফেলে ওরা নিজেদের বুযুর্গী জাহির করে থাকে মাত্র।

(১২) বিদআতের অন্যতম প্রভাব এই যে, বিদআতী তার দ্বারা দ্বীনের সৌন্দর্য বিনষ্ট করে এবং তার অনাবিল রূপে আবিলতা আনে। বিদআতীদের বহুবিধ কুসংস্কার ও কু-আচরণ দেখে ইসলামের শত্রুরা দ্বীনের প্রতি কটাক্ষের সহিত বিদ্রূপ

হানে। দরবেশীরূপ, বৈরাগী হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি, নযর-নিয়াযের নামে অসদুপায়ে ভক্তদের অর্থহরণ, গাঁজা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সেবন প্রভৃতি দেখে সকলের মনে ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। ফলে দ্বীনের আসলরূপ চাপা পড়ে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করা হতে অনেক মানুষ দূরে সরে যায়। বরং বহু অজ্ঞ মুসলিমের মনেও ইসলামের প্রতি বিরাগ জন্মে। ফলে বিদআতীরা মানুষের হেদায়াতের পথে বাধা হয়ে দাড়ায়।

(১৩) বিদআত মুসলিম জাতির সংহতি ও ঐক্য ধ্বংস করে। সুসংবদ্ধ সমাজের অভ্যন্তরে বিছিন্নতা সৃষ্টি করে, এক এক ধরনের অভিনব বিশ্বাস কর্ম বা কর্মপদ্ধতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জামাআত বা দল গঠিত হয়। মতানৈক্যের কারণে এক দল অপর দলের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব রাখে। এক দল অপর দলকে ভ্রষ্ট, কাফের বা বিদআতী ভাবে। প্রতি দলের অনুসারী নিজের দলীয় নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং বিপক্ষের নীতির প্রতিবাদ করে। ভাবে তার দলই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদেরকে আল্লাহ মানুষের জন্য নির্বাচিত করেছেন। অন্ধ পক্ষপাতিত্বের পরিণাম শেষে এই দাঁড়ায় যে, একদল অপর দলের জান মাল হালাল মনে করে! এই অবকাশে কোন ইসলাম দুশমন সুবর্ণ-সুযোগ পায়। অগম্য ইসলাম দুর্গের উদ্দেশ্যে এই ছিদ্রপথ ব্যবহার করে এবং ইসলামের অপরাজেয় শক্তিকে ভিতর থেকে মুসলিমদের সাহায্যেই নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে কৃতার্থ হয়ে যায়। যখন অনল্প অর্থ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরা পরাভূত হয়ে পড়ে।

আল্লাহর রসূল ﷺ সত্যই বলেছেন, "অনতি দূরে বিজাতিসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে; যেমন ভোজনকারীগণ (একই) ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়।" একজন বলল, 'আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন,"বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতারিত আবর্জনার ন্যায়। আল্লাহ তোমাদের শত্রুর বক্ষ হতে (তোমাদের প্রতি) ভীতি ছিনিয়ে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা প্রক্ষিপ্ত করবেন।" একজন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! সে দুর্বলতা কি?' তিনি বললেন, "দুনিয়াকে ভালবাসা এবং মরতে না চাওয়া।" *(আবু দাঊদ)*

সংখ্যায় বেশী থাকলেও অনৈক্যের ফলে দুর্বল রয়ে যাবে। ঘনঘটা মেঘের কোথাও কোথাও বিজলী এবং গর্জন থাকলেও কোন বর্ষণ থাকবে না।

'ভিতরে দিতে যত মরিয়াছি বাহিরের দিকেও তত,

গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগলের মত।'

অথচ বিধানকর্তা এ জাতিকে সতর্ক করে বলেছেন,

﴿ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (কুরআন ও দ্বীন)কে শক্ত করে ধারণ কর এবং পরস্পর বিছিন্ন হয়ো না। *(সূরা আলে ইমরান ১০৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ ﴾

অর্থাৎ, --তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে (মতভেদ করে) বিছিন্ন হয়ো না।" *(সূরা শূরা ১৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴿١٠٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, "তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। *(সূরা আলে ইমরান ১০৫ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (হে নবী) তুমি কোন কিছুতে তাদের অন্তর্ভুক্ত নও (এবং তারাও তোমার দলভক্ত নয়)। তাদের বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত, আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন।" *(সূরা আনআম ১৫৯ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺও উম্মতকে সাবধান করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, "ইয়াহুদ একাত্তর দলে এবং নাসারা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার একটি মাত্র দল ছাড়া সবগুলিই জাহান্নামী হবে।"

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন,'সেই একটি দল কোন্টি, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "যে দল আজ আমি ও আমার সাহাবাগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(আবু দাঊদ, তিরমিযী)*

কিন্তু মূর্খতা ও যুলুম সকল মন্দের মূল। এই উভয় হতেই শুরু হয় ভুল বুঝাবুঝি। ফলে অনেকে নিজেকে ত্রুটিহীন মনে করে অথবা নিজের মান্যবরকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভুলমুক্ত জ্ঞানী মনে করে প্রকৃত হক ও সত্য চিনতে ভুল করে বসে এবং শুরু হয় দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতা।

(১৪) সমাজকে সাবধান ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বিদআতীর গীবত করা বৈধ; যেমন ফাসেক ও প্রকাশ্যে পাপে লিপ্ত ব্যক্তির সমালোচনা ও চর্চা করা হারাম নয়। বরং প্রয়োজন ক্ষেত্রে তা ওয়াজেব হয়ে পড়ে। যেমন যদি কেউ বিদআতী বা দুষ্কৃতীর সহিত অজান্তে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়তে, তার প্রতিবেশ গ্রহণ, ব্যবসা বা অন্য কোন ব্যবহারিক জীবনে অংশী হতে কারো নিকট পরামর্শ বা খোঁজ-খবর নেয়, তবে জানা থাকলে নসীহতের নিয়তে তার নিকট ঐ ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা খুলে বর্ণনা করা ওয়াজেব হবে।

অনুরূপভাবে কোন তালেবে ইল্মকে যদি কেউ কোন বিদআতীর নিকট বসতে বা ইল্ম শিক্ষা করতে দেখে তবে (হিংসা করে নয় বরং) নসীহতের নিয়তে ঐ তালেবকে সতর্ক করা তার জন্য ওয়াজেব।

বিদআতীর প্রকাশ্য গীবত করা এবং জনসাধারণকে হুশিয়ার করা কেবল ইনসাফের সাথে তার বিদআতের উল্লেখ করতে হবে। অন্য কারণ না থাকলে তার অন্যান্য দোষ-ত্রুটি বয়ান করা বৈধ্য হবে না। যেমন ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটাবার উদ্দেশ্যে বা ঈর্ষায় কাতর হয়ে অথবা কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে অথবা ব্যক্তিগত কোন প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঐ সুযোগের অপব্যবহার করা আদৌ বৈধ হবে না।

(১৫) বিদআতীদের সাধারণ স্বভাব এই যে, তারা পথ ও মত পরিবর্তনের সময় বিদআত থেকে অধিক নিকৃষ্টতর বিদআতের প্রতি ধাবমান হয়। আল্লাহ তাআলা তাদের বক্রতার প্রতিদান দেন। যেহেতু কৃতকর্মের প্রকাররানুরূপ প্রতিফলই স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْۚ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর যখন ওরা বক্রপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ ওদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। *(সূরা সাফ্ফ ৫ আয়াত)*

ইয়াহয়্যা বিন আবী উমার শাইবানী বলেন, 'বলা হত যে, বিদআতীদের তওবা আল্লাহ অগ্রাহ্য করেন এবং বিদআতী অধিকতর মন্দ বিদআতের দিকে স্থানান্তরিত হয়।'

এ প্রসঙ্গেই আওয়াম বিন হাওশাব তাঁর পুত্রের উদ্দেশ্যে বলতেন, হে (বৎস) ঈসা! তুমি তোমার চিত্ত বিশুদ্ধ কর ও ধন অল্প কর। আল্লাহর কসম! ঈসাকে বিরুদ্ধাচারী (বিদআতী)দের দলে বসতে দেখার চাইতে তাকে গানবাদ্য ও মদের মজলিসে বসতে দেখা আমার নিকট (তুলনামূলকভাবে) অধিকতর পছন্দনীয়।"

কারণ বিদআতী তার বিদআতকে দ্বীন মনে করে এবং দ্বীনকে ধারণ ও মান্য করার মতই বিদআতকে ধারণ ও মান্য করে চলে। আবার কোন কারণবশতঃ ঐ বিদআত থেকে বহির্গত হলে অন্য কোন বড় বিদআতে প্রবেশ করে। কিন্তু মহাপাপী যারা; যেমন গান-বাদ্যকারী ও শ্রবণকারী মদ্যপায়ী ইত্যাদি তারা নিজ কামবশীভূত। তারা জানে যে, তারা যা করে তা মহাপাপ। কিন্তু তাদের কামপ্রবৃত্তি এবং মন্দকর্ম-প্রবণ আত্মার বশবর্তী হয়ে তা বর্জন করতে সহজে সক্ষম হয় না। সম্ভবতঃ তাদের অবৈধতা-জ্ঞানের ফলে কখনো তা পরিহার করতেও পারে। যেহেতু গোনাহগার মানুষের ক্ষেত্রে তওবা, অনুশোচনা এবং সমূলে মন্দ কাজ বর্জন করার অধিক সম্ভাবনা ও আশা থাকে; যতটা বিদআতকে ধর্ম জ্ঞানকারী বিদআতীর ক্ষেত্রে থাকে না।

সেই বিদআতীর তওবার কোন আশা থাকে না, যার হৃদয়ে বিদআত বদ্ধমূল হয়ে অন্তস্তলে বড় জায়গা জুড়ে স্থান গ্রহণ করেছে। যার জন্য বিদআতকেই প্রকৃত দ্বীন মনে করে এবং তার প্রতিকূল সব কিছুকে পার্শ্বে বর্জন করে। বিদআতে বিজ্ঞ হয়ে অন্ধভাবে তাই পছন্দ করে। যে তা পছন্দ ও গ্রহণ করে তাকে ভালোবাসে এবং যে অপছন্দ ও অগ্রহণযোগ্য মনে করে তাকে মন্দ বাসে ও ঘৃণা করে। বরং অনেক ক্ষেত্রে শত্রু মনে করে। তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং তার বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বেপরোয়া লড়াই লড়ে।

যেমন প্রাচীন খাওয়ারেজ বিদআতীরা; যারা বিশ্বাস রাখে যে, যে ব্যক্তি কাবীরাহ গোনাহ করবে সে কাফের হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে। যারা কখনো এই বিশ্বাস ও ধারণা হতে বিচ্যুত হয়নি। (অবশ্য কিছু মানুষ সঠিক পথে ফিরে এসেছিল।) অথচ তাদের ঐ ধারণার প্রতিকূলে কুরআনী আয়াতে এবং সহীহ হাদীসে স্পষ্ট দলীল রয়েছে। কিন্তু তারা তা পৃষ্ঠপিছে বর্জন করে শরীয়তের বিরোধিতায় অটল থেকেছে। পরন্তু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সহিত শির্কের অপরাধ ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। *(সূরা নিসা ৪৮ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে থাকে।" তিনি এইরূপ তিনবার পুনঃ পুনঃ বলেছেন।

অনুরূপ আরো বহু দলীলাদির উপর ভিত্তি করে আহলে সুন্নাহ বলে, মহাপাপী আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে; যদি তিনি চান তবে তাকে মার্জনা করবেন, নচেৎ তার পাপ অনুযায়ী পরিমাণ মত শাস্তি প্রদান করবেন এবং (তওহীদের গুণে) তার প্রত্যাবর্তন স্থান হবে জান্নাত। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ ﴾

অর্থাৎ, বল, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য--। *(সূরা কাহাফ ১১০ আয়াত)*

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿ قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ ﴾

অর্থাৎ, বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গায়ব (অদৃশ্য) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। *(সূরা নাম্‌ল ৬৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ ﴾

অর্থাৎ, (হে মুহাম্মাদ!) বল, আমি তোমাদেরকে এ কথা বলি নি যে, 'আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে।' আর গায়ব (অদৃশ্য) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই--। *(সূরা আনআম ৫০ আয়াত)*

এই আয়াতসমূহ এবং আরো অন্যান্য আয়াত ও হাদীস শরীফের উপর ভিত্তি করে আহলে সুন্নাহ বলে যে, আল্লাহর নবী মানুষ ছিলেন এবং তিনি গায়ব জানতেন না, গায়বী খবর তিনি ওহীর মাধ্যমে জানতেন ও জানাতেন।

কিন্তু বিদআতীরা ঐ সমস্ত দলীলকে পশ্চাতে ফেলে ভক্তির আতিশয্যে প্রিয় নবী ﷺ-কে 'আশরাফুল মাখলুকাত' (সৃষ্টির সেরা জীব) হতে বহিষ্কৃত করে এবং তাঁর

জন্য গায়বীর দাবী করে আল্লাহর আসনে তাঁকে বসাতে দ্বিধা করে না। কেউ বা তাঁর শরীয়তকে পদদলিত করে ফুর্তি মেরে 'মারেফতী'র দাবী করে অলী সেজে বসে। অথচ অলি হয়ে যে পরিমল আহরণ করে তার সবটাই গরল। হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করে ব্যবহার করে! এবং তারই মাধ্যমে অজ্ঞ সাদা মানুষদের মন ও হৃদয় লুটে ফায়দা উঠায়। মরণকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে নয়, যেখানে আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর নিজের জন্য দুআ ও দরূদ পড়তে বলেছেন, সেখানে মওতাদের জন্য দুআর উদ্দেশ্যে নয়, পরকালকে স্মরণ করে হৃদয়ে ভয় আনার উদ্দেশ্যে নয়, বরং মৃত্যের কাছে জীবন চাইতে নিঃস্বের কাছে সম্পদ চাইতে এবং পরকালের দুয়ারে ইহকাল চাইতে কবর যিয়ারত (পূজা) সিজদা, চুম্বন, তওয়াফ, তাবার্রুক, উরস ইত্যাদি দ্বারা নতুন শরীয়ত রচিত করে।

ওরা মহব্বতে রসূলের নামে সেই কাজ করে যাতে ওদের খুশীর ভরপুর সমাগম ঘটে। ভিন্ন জাতির অনুকরণে দ্বীনকে কেবল নিজেদের স্বার্থ, আনন্দ ও সুস্বাদ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে আংশিক ধারণ করে থাকে। আর নিরানন্দে একটু স্বার্থ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারে ওরা আদৌ মহব্বতের পরিচয় দেয় না। আর ভাবে ঐ অনুষ্ঠানগত মহব্বতই জরুরী ও যথেষ্ট। বাকী তাঁর আদর্শে চরিত্র গড়া, তাঁর নির্দেশ পালন করা, তিনি যা পছন্দ করেছেন তা পছন্দ করা ইত্যাদিকে অজরুরী ও ফালতু ভাবে।

পক্ষান্তরে, পার্থিব জীবনে প্রেমের কোন নির্দিষ্ট ধারা নেই, নিয়ন্ত্রিত গতি নেই। হাবীব তার মাহবূবকে যে কোন প্রকারে যে কোন উপায়ে এবং যে কোন মাধ্যমে তার মহব্বত জানাতে পারে। তাতে কোন বাধা নেই, নিয়ন্ত্রণ নেই এবং সুশৃঙ্খলতা নেই। কিন্তু বান্দার জন্য আল্লাহ এবং উম্মতের জন্য রসূল এমন মাহবুব, যিনি কেবল নিয়ন্ত্রিত প্রেমই পছন্দ করেন। কপট, হীন উচ্ছৃঙ্খল বা স্বার্থের প্রেম আদৌ পছন্দ করেন না। নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাণের বাইরে কোন প্রেমের অতিরঞ্জন তাঁর নিকট প্রীত নয়। যেহেতু পার্থিব প্রেমে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে হাবীব-মাহবুব উভয়ের মান-মর্যাদা অথবা কোন না কোন দিক সমপরিমাণ থাকে; যাতে উভয়ের মনের উচ্ছ্বাস গতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে একে অপরকে ইচ্ছামত বলে এবং ইচ্ছামত উপহার দেয়। কিন্তু সেই মাহবুব যিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, জীবনদাতা, প্রতিটি জীব যাঁর দয়ার মুক্ষাপেক্ষী; তিনি একমাত্র মাবুদ এবং সেই মাহবুব যিনি অনুসৃত, যাঁর আদেশ কেউ অমান্য করলে, যাঁর নির্দেশ কেউ লংঘন করলে জাহান্নামের মহাগ্নি তার উপযুক্ত শাস্তি হয়, যে মাহবূব তাঁকে ভালোবাসার উপায় শিক্ষা দিয়েছেন, প্রেমের ধরন বলে

দিয়েছেন, যাতে ভালোবাসতে গিয়ে কেউ বেআদবী করে না বসে। এমন মাহবূবের জন্য হাবীবের হৃদয়ে সদা ভয় থাকে; যাতে প্রেম নিয়ন্ত্রণ-হারা, নিয়ম-ছাড়া, বন্ধন-হারা ও বেয়াড়া না হয়ে যায়। পার্থিব প্রেমে অতিরঞ্জন চলে, কখনো বা উপহাসছলে বেআদবী চলে কিন্তু আল্লাহ ও রসূলের প্রেমে নিছক আদব, তা'যীম ও আনুগত্য থাকে। তাইতো ওযুর অঙ্গ তিন বারের পরিবর্তে চার অথবা তার অধিক বার ধৌত করা বৈধ নয়। যদিও অধিকবার ধৌত করায় অধিক অপবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়। তাইতো আল্লাহর প্রেমে তন্ময় হয়ে ফজরে দুয়ের স্থানে চার রাকআত ফরয পড়া প্রেমিক বান্দার জন্য বৈধ নয়। যেহেতু তাঁর প্রেমের পথ নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত। এই নির্দিষ্ট সীমা দ্বারাই তাঁর প্রকৃত প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা হয়। তাই নির্দেশিত সরল পথ ব্যতীত অন্যান্য বঙ্কিম পথে তাঁর মহব্বত হাসিল হয় না।

পক্ষান্তরে প্রেমিকা কেবল শাড়ীর আবেদন জানালে তার সঙ্গে বাড়তি ব্লাউজ ও চুড়ি নিবেদন করলে সে নারাজ হয় না বরং আরো অধিক খুশী হয় এবং প্রেমের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ভৃত্য সারা দিনের কর্তব্য পালন করেও যদি রাত্রে প্রভুর গা-পা দাবায় তবে প্রভু খুশী হয়ে তার বেতন বৃদ্ধি করে; নারাজ হয় না।

হ্যাঁ ব্লাউজ ও চুড়ি যদি প্রেমিকার দেহাঙ্গের মাপ ও তার পছন্দমত হয় এবং ভৃত্যের ঐ বাড়তি খিদমত যদি প্রভুর সময় ও প্রয়োজন মত হয় তবেই তা সম্ভব। নচেৎ ভালোবাসার ঝুলিতে ভর্ৎসনাই স্থান পাবে। আবার শাড়ী ব্যতীত অন্য কিছু বাড়তি আনলে এবং কাজ ছেড়ে প্রভুর পা দাবালে কি হবে তা বলাই বাহুল্য।

অনুরূপভাবে শরীয়তের পছন্দমত যে সব নফল (বাড়তি) কাজের নির্দেশ আছে তা করলে তো আল্লাহ খুশীই হন। কিন্তু তাঁর নির্দেশ ও পছন্দের বাইরে নিজের মনগড়া কিছু করতে চাইলে অবশ্যই বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। আবার তাঁর নির্দেশ অমান্য করে অতিরিক্ত অন্য কিছু করে মহব্বত প্রকাশ করতে চাইলে জাহেল হাবীব এটাই বুঝে যে, সে তার মাহবুব ও শরীয়ত অপেক্ষা অনেক বেশী বুঝে। আবার এতটা বলতে দুঃসাহস করে যে, 'শরীয়ত তো একটা পিয়াজের মত যার সবটাই খোসা (ছাল)!' অর্থাৎ যার সার ও আসল কিছুই নেই !! শরীয়তের আলেম ও অনুগামীরা তো কেবল পানারী পাতার মত; যা পানির গভীরতার উপরেই ভেসে বেড়ায় ইত্যাদি!!! এ ধরনের ছন্নছাড়া, বাঁধনহারা মহব্বতের দাবীদারদের অবস্থা যে কি হবে, তা জ্ঞানীদের নিকট সহজেই প্রতীয়মান।

বিদআতীদের এমন অনেক মানুষ আছে যারা বিদআতকে অন্তর্মূলে স্থান দেয় না,

তবে তা ভালো জেনে এবং তাতে আল্লাহ খুশী হবেন এই মনে করে লোকের দেখাদেখি সাধারণভাবে তা করে থাকে। কিন্তু তার বিপরীত কোন দলীল বা নীতিকথা শুনলে উদার মনে তা পরিত্যাগ করে প্রকৃত দ্বীনকে হীন সেবকরূপে ধরার চেষ্টা করে এবং বিদআত হতে তওবা করে। অবশ্যই তারা পথপ্রাপ্ত এবং তাদের জন্যই মুক্তি।

বিদআতের নীতিমালা

যে সমস্ত উপায়ে বিদআত চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং যে সকল কর্মকে শরীয়তে বিদআত বলে গণ্য করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ-

(১) প্রতি সেই কথা, কাজ ও বিশ্বাস; যদিও বা তা ইজতেহাদী হয়; যা সুন্নাহর প্রতিকূল হয়, তা বিদআত।

(২) প্রতি সেই কর্ম যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের আশা করা যায় অথচ শরীয়ত তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তা করলে বিদআত করা হয়।

(৩) প্রতি সেই বিষয় যা কোন বর্ণনা বা নির্দেশ ব্যতীত বিধেয় হওয়া সম্ভব নয় অথচ সে বিষয়ে শরীয়তের কোন বর্ণনা বা নির্দেশ নেই, তা বিদআত। অবশ্য কোন সাহাবী কর্তৃক কোন ইঙ্গিত বা নির্দেশ থাকলে, তা বিদআত বলা যাবে না।

(৪) কাফেরদের সেই আচার-অনুষ্ঠান বা প্রথা; যা ইসলামে ধর্ম বা ইবাদতরূপে (বা করতে হয় ভেবে) পালন করা হয়, তা বিদআত।

(৫) যে বিষয়ের মুস্তাহাব হওয়ার উপর কোন ফকীহ বা আলেম -বিশেষ করে পরবর্তীকালের উলামাগণ বিবৃতি পেশ করেছেন অথচ তার সপক্ষে কোন শরয়ী দলীল নেই, সে বিষয়ও বিদআত।

(৬) প্রতি সেই ইবাদত বা আমল যার পদ্ধতি ও প্রণালী যয়ীফ অথবা মওযু' (গড়া বা জাল) হাদীস ব্যতীত অন্য কোন সহীহ বা হাসান হাদীসে বর্ণিত হয়নি, তা করা বিদআত।

(৭) ইবাদতে প্রত্যেক অতিরিক্ত, অতিরঞ্জিত ও বাড়তি কাজই (অর্থাৎ ইবাদতে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমালংঘন করাই) বিদআত।

(৮) প্রত্যেক সেই ইবাদত যা শরীয়ত সাধারণভাবে পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে; কিন্তু মানুষ তাকে কোন স্থান, কাল, গুণ, নিয়ম-পদ্ধতি, সংখ্যা বা কারণ প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নির্দিষ্ট করে নিয়েছে তা বিদআত। *(আহকামুল জানায়েয, আলবানী)*

(৯) প্রত্যেক সেই আচার, কুপ্রথা বা কুসংস্কার; যা শরীয়ত-সম্মত নয় এবং বিবেক ও জ্ঞান-সম্মতও নয়, যা কিছু জাহেল দ্বীন ও করণীয় কর্তব্য মনে করে তা বিদআত। *(মানাসেকুল হজ্জ, আলবানী ৪৫ পৃঃ)*

এই সকল বিদআতের দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে।

প্রচলিত কিছু বিদআতের নমুনা

পূর্বে আলোচিত বিদআত সৃষ্টির বিভিন্ন কারণেই মুসলিমদের মাঝে বহু বিদআত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে, যার কিছু তো কুফ্র মহাপাপ এবং কিছু বিদআত আছে যা করলে সাধারণ বিরুদ্ধাচরণের পাপ করা হয়। সেই প্রচলিত কিছু বিদআতের নমুনা সংক্ষেপে পেশ করা উচিত মনে করছি। অবশ্য শুরুতেই খেয়াল রাখা উচিত যে, উল্লেখিত কর্মগুলি শরীয়ত বা বিধেয় কর্ম ভেবে করলে তবেই তা বিদআত বলে গণ্য হবে, নচেৎ তা সাধারণ ভুল অথবা নিষিদ্ধ কর্মরূপে বিবেচিত হবে।

কুরআন বিষয়ক বিদআত

কুরআন প্রসঙ্গে সে সমস্ত বিদআত প্রচলিত আছে; যেমন এমন ঢঙ্গে টেনে পড়া যাতে কুরআনের শব্দবিন্যাস বিনষ্ট হয়ে যায়। তেলাঅত শেষে 'সাদাকাল্লাহুল আযীম' পাঠ। মুর্দার উপর, কবরের উপর কুরআন পাঠ। সেহরীর আযানের পরিবর্তে কুরআন পড়ে জাগ্রতকরণ। জুমআর দিনে প্রয়োজনে খুতবার আযানের পূর্বে আর এক আযান দেওয়ার পরিবর্তে কুরআন (সূরা জুমআহ) পাঠ করে ডাকা হাঁকা।

শবীনা পাঠ, কুলখানী, ফাতেহাখানী, আয়াতের নক্সা বানিয়ে দেওয়ালে লিখা বা বাঁধিয়ে টাঙ্গানো। মুসহাফ নিয়ে কপালে, চোখে বা বুকে ঠেকানো, স্পর্শ করে গায়ে মাখা, চুম্বন করা। খতমের বাঁধা দুআ।

নবী বিষয়ক বিদআত

নবী ﷺ-কে কেন্দ্র করে যে সব বিদআত আকীদায় এসেছে; যেমন এই বিশ্বাস করা যে, তিনি মানুষ ছিলেন না, তিনি গায়েব জানতেন, তাঁর দেহের ওজন ও ছায়া ছিল না। তাঁর মল-মূত্র পবিত্র ছিল। তিনি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি ছিলেন এবং তাঁর নূর থেকে জগৎ সৃষ্টি। তিনি হাযির ও নাযির; তিনি মীলাদ মাহফিলে হাযির হন। তিনি পার্থিব জীবনের ন্যায় জীবিত আছেন। কিছু চাইলে তিনি দিতে পারেন। তাঁর

কবর যিয়ারত করলে পাপ ক্ষয় হয় ইত্যাদি।

আওলিয়া বিষয়ক বিদআত

ওলী-আওলিয়া নিয়ে প্রচলিত বিদআত যেমন, তাঁরা পার্থিব জীবনের ন্যায় জীবিত আছেন মনে করা। তাঁরা আহবানকারী ভক্তের আশা পূর্ণ করতে পারেন, রোগ ও বিপদ মুক্ত করতে পারেন, ধন ও সন্তান দান করতে পারেন, তাঁরা অদৃশ্যের (গায়বী) খবর জানেন ইত্যাদি বিশ্বাস করা; যাতে মানুষ মুশরিক হয়ে যায়। কোন ওলীর ত্যক্ত বস্তুর মাধ্যমে তাবার্রুক (বরকত) গ্রহণ। জীবিত, প্রকৃত অথবা কল্পিত ওলির এঁটো বা ব্যবহৃত কোন জিনিস ব্যবহার করে বর্কত ও কল্যাণের আশা করা ইত্যাদি।

মসজিদ বিষয়ক বিদআত

মসজিদ বিষয়ক বিদআত যেমন; মসজিদ অধিক সৌন্দর্য-খচিত ও রঙচঙে করা। মসজিদে কারো কবর দেওয়া। মসজিদে সাংসারিক ও বৈষয়িক গল্পগুজব করা। কলরব, অট্টহাসি, অবৈধ সমালোচনা করা। মসজিদের দেওয়াল, মিম্বর বা ধূলা স্পর্শ করে গায়ে মেখে বর্কত বা আরোগ্যলাভের আশা করা ইত্যাদি।

আযান বিষয়ক বিদআত

আযানের বিদআত যেমন; জুমআর দ্বিতীয় আযান মিম্বরের গোড়ায় নিম্নস্বরে দেওয়া। আযানের পর উচ্চরবে দরূদ ও দুআ পাঠ করা। অসীলার দুআয় 'অদদারাজাতুর রাফীআহ' বৃদ্ধি করা। আযানের পর পুনরায় নামাযের জন্য আহবান করা। 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদ--' শুনে চোখে আঙ্গুল বুলিয়ে তা চুম্বন করা। 'আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম'-এর উত্তরে 'সাদাক্‌তা ওয়া বারারতা' বলা। 'কাদক্বা-মাতিস সালাহ' শুনে 'আক্বামাহাল্লাহু আদামাহা' বলা। আযানের শেষে হাত তুলে দুআ পড়া।

নামায বিষয়ক বিদআত

নামায সম্পর্কিত বিদআত যেমন, ফজরের নামাযে কুনুত, কুনুতের পরিবর্তে 'কুল' পাঠ। তকবীরে তাহরীমার সময় হাত তুলে কান স্পর্শ করা। এই সময় উপর দিকে মাথা তোলা। বাঁধা-গড়া নিয়ত পড়া। নিয়ত (যে কোন ভাষাতে) মুখে উচ্চারণ করা। সমস্বরে উচ্চরবে 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বলা। দুই সিজদাহর মাঝের বৈঠকে অনুরূপভাবে দুআ পড়া। সালাতুত তাহফীয (কুরআন হিফ্য সহজে হবে নিয়তে বিশিষ্ট) নামায পড়া। সালাতুত তাসবীহ জামাআত করে পড়া। মা-বাপের নামে বিশিষ্ট নামায পড়া। শবেবরাতের বিশেষ নামায পড়া। নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুঁক দেওয়া, সালাম ফিরে মাথায় হাত রেখে বিশেষ দুআ পাঠ শেষ রাকআতের শেষ সিজদাহ লম্বা করা।

জুমআহ বিষয়ক বিদআত

জুমআহ সংক্রান্ত বিদআত যেমন, জুমার দিন সফর করতে নেই মনে করা। এই দিনে কোন কাজ করতে নেই ভাবা। জুমআর জন্য পাপ (যেমন দাঁড়ি চাঁচা, সোনা বা রেশম ব্যবহার) দ্বারা সৌন্দর্য ধারণ করা। মসজিদে মুসাল্লা বিছিয়ে স্থান দখল করা। তিন সিড়ির অধিক মিম্বর। জুমআর দিন মিম্বরকে কার্পেটাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা। জুমআহ বা ঈদের নামাজের জন্য বিশেষ করে পাগড়ী বাঁধা। দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভিতর খতীবের সামনে দেওয়া। প্রথম আযানের পরিবর্তে কুরআন পাঠ ও ডাক-হাঁক। জুমআর (নামাযীদের নামায পড়ার) সময় মসজিদের উচ্চরবে কুরআন পাঠ। জুমআর পূর্বে নির্দিষ্ট রাকআত 'কাবলাল জুমআহ' সুন্নত পড়া। খুতবায়ে হাজাহ (আলহামদু লিল্লাহহি নাহমাদুহু--) পাঠ বর্জন করা। সূরা ক্বাফ দ্বারা উপদেশ না দেওয়া। সুর করে খুতবা পাঠ। নবীর নাম শুনে (দরূদ না পড়ে) আঙ্গুল দ্বারা চক্ষু স্পর্শ করে তা চুম্বন করা। দুই খুতবার মাঝে কোন দুআ বা সূরা পাঠ। ইমাম বসা কালে হাত তুলে মুনাজাত। খুতবাহ চলাকালীন তাহিয়্যাতুল মসজিদ দুই রাকআত নামায ত্যাগ। দুই খুতবার কোন একটিকে নসীহত থেকে বাদ দেওয়া।

(ইস্তিস্কা ছাড়া) খুতবায় ইমামের হাত তুলে দুআ করা এবং মুক্তাদীদের হাত তুলে 'আমীন-আমীন' বলা। "ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল আদলে--" আয়াত দ্বারা খুতবা শেষ করাকে অভ্যাস বানানো।

খুতবাহ লম্বা এবং নামায ছোট ও সংক্ষিপ্ত করা। একই স্থানে বড় মসজিদ থাকতে ছোট মসজিদে জুমআহ পড়া। কাতার সোজা না হওয়ার পূর্বেই ইমামের নামায শুরু করে দেওয়া। নামাযের পর 'তাকাব্বাল্লাহ---' বলে পরস্পর মুসাফাহ করা। মসজিদের গেটে পানি হাতে দাঁড়িয়ে থেকে মুসল্লীদের ফুঁক অথবা থুথুর বর্কত নেওয়া ও রোগ মুক্তির আশা রাখা।

রমযান বিষয়ক বিদআত

তারাবীহতে বিদআত যেমন, মাঝে ও শেষে হাত তুলে জামাআতী দুআ করা ও দরূদ পড়া। মাগরেবের মত বিত্র পড়া। দুআ কুনুত পড়ার সময় রফএ-ইদাইন (অর্থাৎ তাহরীমার মত কান বরাবর হাত তোলা)। তারাবীহর পর মিষ্টান্ন বিতরণ। শবে কদরে বিশেষ করে মিষ্টি বিতরণ। কেবল খাওয়া-দাওয়া ও জলসার মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ।

সালাম বিষয়ক বিদআত

সালামে বিদআত যেমন, দুই হাতে মুসাফাহ করা এবং বুকে হাত ফিরানো। সালামের পরিবর্তে 'হেলো' 'আহলান' 'গুডমর্নিং' ইত্যাদি বলা। সালামের সময় প্রণত হওয়া। ঝুঁকে পা স্পর্শ করে সালাম করা। কদমবুসী করা। সিজদা করা (কুফ্র)।

দুআ বিষয়ক বিদআত

দুআর প্রচলিত বিদআত যেমন; উচ্চস্বরে দুআ করা, ফরয নামাযের পর, বিবাহ বন্ধনের পর, ইফতারের পূর্বে, ঈদের নামাযের পর, জানাযার নামাযের পর বা দাফনের পর, জালসার শেষে, দর্সের শেষে একত্রে হাত তুলে জামাআতী দুআ করা ও 'আমীন আমীন বলা'। হাত তুলে দুআর পর মুখে হাত বুলানো বা বুক স্পর্শ করা অথবা হাত চুমা।

সফর বিষয়ক বিদআত

সফর ও ভ্রমণের বিদআত যেমন; সফর মাসে সফর করতে নেই ভাবা। অনুরূপ জুমআর দিনে সফর না করা। ঘর হতে কেউ বের হওয়ার পর ঝাড়ু না দেওয়া। আম্বিয়া ও আওলিয়াদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা।

হজ্জ বিষয়ক বিদআত

হজ্জ সংক্রান্ত বিদআত যেমন; তাওয়াক্কুলের নাম নিয়ে সম্বল ছাড়া হজ্জে বের হওয়া। হাজীদের নিকট হতে ট্যাক্স নেওয়া। ইহরাম বাঁধার সময় বিশিষ্ট নামায পড়া। ইহরাম বাঁধার পর থেকেই সর্বদা ইযত্বিবা (ডান কাঁধ বের) করে রাখা। মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদের যিয়ারত করা। বিভিন্ন পাহাড় যেমন, গারে হিরা, সওর প্রভৃতি ভ্রমণে বর্কতের আশা করা। মসজিদে আয়েশা (বা অন্যান্য মসজিদে) সওয়াবের উদ্দেশ্যে নামায পড়তে যাওয়া। হজ্জ বা উমরাহকারীর কা'বার মসজিদে প্রবেশ করে তাওয়াফ না করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়া। নামাযে হাত তোলার মত তুলে হাজরে আসওয়াদের প্রতি ইশারা করা। পাথর চুম্বনের জন্য ভিঁড় করা। চুম্বনের সময় 'আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা---' দুআ পড়া। চুম্বন করার জন্য নামায পড়ে (ইমামের সালাম ফিরার পূর্বেই) সালাম ফিরে ছুটে পাথরের নিকট যাওয়া। রুক্নে ইয়ামানী চুম্বন করা এবং স্পর্শ করতে না পারলে ইশারা করা। স্পর্শের সময় বিশিষ্ট দুআ পড়া। কা'বার রুকনে শামী বা অন্যান্য দেওয়াল, গেলাফ, মাকামে ইব্রাহীম স্পর্শ করে তাবার্রুক গ্রহণ। কা'বার দরজার বিপরীত দিকে দেওয়ালের এক উঁচু জায়গা 'উরওয়া বুসকা' ধরে তাবার্রুক গ্রহণ, বৃষ্টি হলে অতিরিক্ত সওয়াব বা বর্কতের আশায় তওয়াফ করা। মীযাবের পানি গায়ে মেখে তাবার্রুক গ্রহণ। যমযমের পানি দ্বারা গোসল। বর্কতের আশায় যমযমের পানিতে টাকা পয়সা ভিজানো। যমযম পানি পান করার সময় কেবলা মুখ করে বিশিষ্ট দুআ পাঠ। তওয়াফ ও সাঈতে প্রতি চক্রে নির্দিষ্ট দুআ পড়া।

আরাফায় নির্দিষ্ট দুআ পড়া। জাবালে রহমতে চড়া, মুযদালিফায় পৌঁছে প্রথমে নামায আদায় না করে পাথর সংগ্রহ করা। মুযদালিফায় রাত্রি জাগরণ করা। মুযদালিফা থেকে পাথর নেওয়া সুন্নত বা জরুরী ভাবা, পাথর মারার পূর্বে পাথর ধৌত করা। পাথর মারার সময় তকবীর পড়ার সাথে অন্যান্য দুআ (যেমন রাজমাল লিশশায়াত্বীন' ইত্যাদি) পড়া। পাথর মারার জন্য হাত বা আঙ্গুলের নির্দিষ্ট আকার বা ভঙ্গিমা করা। পাথর মেরে জুতা ইত্যাদি মারা।

কুরবানী না করে তার মূল্য সদকাহ করা। যবেহ করার আগে কুরবানীর পশুকে গোসল দেওয়া, তার খুর ও শিঙে তেল দেওয়া অথবা তার অন্য কোন প্রকার তোয়ায করা।

হাজীর বাম দিক হতে মাথার চুল কামানো। কিছু নেড়া করে কিছু পরে নেড়া করার জন্য চৈতন রাখার মত কিছু চুল ছেড়ে রাখা। নেড়া করার সময় কেবলা মুখ করা, এই সময় বিশিষ্ট দুআ পড়া।

যে হজ্জের ফরয আদায় করে আসে তাকে 'হাজী' বা 'আলহাজ্জ' বলা। বিদায়ী তওয়াফে পর মসজিদ থেকে উল্টা পায়ে বের হওয়া। একই সফরে বার বার উমরা করা। মক্কার মাটি বর্কতের আশায় সঙ্গে আনা।

দরূদ ও যিক্র বিষয়ক বিদআত

দরূদে বিদআত যেমন; বাঁধাগড়া দরূদ পাঠ, দরূদ পড়তে কিয়াম করা, সমস্বরে উচ্চরবে দরূদ পড়া।

যিক্রের প্রচলিত বিদআহ যেমন, জামাআতী যিক্র, শরীয়তে নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিক্র করা। 'হু-হু বা হুয়া-হুয়া' অথবা কেবল 'আল্লাহ-আল্লাহ' করে যিক্র করা। কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে ভেঙ্গে যিক্র করা; অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সংখ্যায় 'লা ইলাহা' বলা এবং পরে আবার নির্দিষ্ট সংখ্যায় 'ইল্লাল্লাহ' বলা বা 'ইল-ইল' বলে যিক্র হাঁকা। 'ইয়া মুহাম্মাদ' বা 'ইয়া আলী'র যিক্র হাঁকা। উচ্চস্বরে যিক্র, হেলে-দুলে যিক্র, নেচে হাততালি দিয়ে যিক্র। কোন ওলীর নামে যিক্র। তসবীহ দানা ব্যবহার (যাতে রিয়ার আশঙ্কাও থাকে)। কিছু (চিঠি) লিখার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ'র পরিবর্তে 'এলাহি ভরসা', 'আল্লাহ মহান' ইত্যাদি লিখা অথবা ৭৮৬ লিখা।

পবিত্রতা বিষয়ক বিদআত

ওযূর মধ্যে বিদআত যেমন, গর্দান মাসাহ। ওযুর পর আকাশের দিকে তাকিয়ে 'ইন্না আনযালনা' বা অন্য কোন সূরা পাঠ। প্রত্যেক অঙ্গ ধৌতের সময় এক এক নির্দিষ্ট দুআ। গোসল করার (ডুব দেওয়ার) সময় কেবলা মুখ করা। গোসল (ডুব দেওয়ার) পর বাঁধা হিঁয়ালি পড়া।

মৃত্যু ও জানাযা বিষয়ক বিদআত

মৃত্যু ও জানাযায় বিভিন্ন বিদআত যেমন; মরণাপন্ন ব্যক্তির শিথানে কুরআন শরীফ রাখা, সূরা ইয়াসিন পড়া, মুমূর্ষুকে কেবলামুখ করা। নবী ও আহলে বায়তের ইমামগণের নাম নিয়ে 'তালকীন' করা। তার নিকট হতে ঋতুবতী, অপবিত্রা, প্রসূতি ও অন্যান্য অপবিত্র মানুষদিগকে দূর করা। রাতে মৃতব্যক্তির পাশে সকাল

পর্যন্ত কোন ভয়ে বাতি রাখা। মৃতব্যক্তির নিকট গোসল না দেওয়া পর্যন্ত কুরআন পড়া। ধূপ ইত্যাদি দিয়ে (অপ্রয়োজনে) সুগন্ধময় করে রাখা। দম যাওয়ার স্থানে লাতা ও ধূপবাতি দেওয়া। দাফন না হওয়া পর্যন্ত মড়া ঘরের কোন মানুষের পানাহার না করা। মৃতব্যক্তির পা তলে দাঁড়াতে নেই মনে করা অথবা দাঁড়াতে ভয় করা।

মৃত্যুর খবর ব্যাপকভাবে (যেমন মাইক ও পত্রিকায়) প্রচার করা (অবশ্য আশেপাশের লোককে মৃত্যুর খবর জানিয়ে জানাযার প্রস্তুতির কথা বলা দোষাবহ নয়।) মৃতব্যক্তির তাহারতের (পবিত্রতার) জন্য ব্যবহৃত খিরকা (বস্ত্রখন্ড) ইত্যাদি দূরে ফেলতে গিয়ে (কোন বিপদের আশঙ্কায়) সঙ্গে লোহা রাখা।

গোসল দেওয়ার সময় প্রত্যেক অঙ্গে পানি ঢালার সময় বার বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বা অন্য যিক্র অথবা বাংলায় বাঁধা হিঁয়ালি পড়া। লোয়ানো পানি ডিঙ্গাতে নেই মনে করা। লাশ উঠানো ও নামানোর সময় এবং পথে নিয়ে যাবার সময় উচ্চস্বরে সকলের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিক্র।

মহিলার চুল চুটি গেঁথে বুকের উপর খোলা ফেলে রাখা। বর্কতের আশায় বা আযাব মাফ হওয়ার আশায় কোন পীর বা ওলীর-সুপারিশ নামা (!) বা শাজারানামা অথবা তাঁর অন্য কিছু অথবা কুরআনী আয়াত বা দুআ কাফনের ভিতরে রাখা। কোন ওলীর কবরের পাশে কবর দেওয়ার জন্য দূর থেকে লাশ বহন করা। মুর্দার গোসলে ব্যবহৃত সাবান, দাফন কাজে ব্যবহৃত অতিরিক্ত বাঁশ ও দাফনে ব্যবহৃত অতিরিক্ত কাপড় ব্যবহার করতে নেই মনে করা অথবা ব্যবহার করতে ভয় করা।

এই বিশ্বাস রাখা যে, মুর্দারা সকলে নিজ নিজ সুন্দর কাফন নিয়ে গর্ব করে। কাফনের উপর কোন আয়াত বা দুআ লিখা। জানাযার খাটকে ফুল ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা। সৌন্দর্যখচিত বা কালেমা অথবা আয়াত লিখিত মখমলের চাদর দ্বারা লাশ ঢাকা। লাশের উপর বা কবরের উপর ফুল দেওয়া। পুষ্পমাল্য দ্বারা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া। জানাযার সাথে পতাকা বহন করা। কোন খাদ্যদ্রব্য বা পয়সা ছিটানো।

এই বিশ্বাস রাখা যে, মৃত ব্যক্তি নেক হলে তার লাশ হাল্কা অথবা ভারী হয়। জানাযা বের হওয়ার সাথে সাথে সদকা করা। চল্লিশ কদম মাত্র জানাযা বহন করে নির্দিষ্ট সওয়াবের আশা করা। লাশ নিয়ে ধীরে চলা। লাশের উপর ভিঁড় জমানো। কোন বিশ্বাসে জানাযার নিকটবর্তী বা সম্মুখবর্তী না হওয়া। নীরবতা ত্যাগ করা। আপোসে তর্কাতর্কি ও বচসা করা। জানাযা সহ কোন ওলীর কবর তওয়াফ করা।

মৃতের উপর জানাযা পড়া হয়েছে তা জানা সত্ত্বেও পুনরায় গায়েবানা জানাযা

পড়া। জানাযার নামাযের কাতারে গোলাপ পানি ছিটানো। জানাযা পড়ার সময় লাশের বাঁধন খুলে দেওয়া। জুতার ময়লা নেই একীন সত্ত্বেও জানাযার নামাযের জন্য জুতা খুলে ফেলা অথবা খুলে তার উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া। নামাযে ইস্তিফতাহর দুআ পড়া। সূরা ফাতিহাসহ অন্য একটি সূরা পাঠ ত্যাগ করা। নামায শেষে হাত তুলে জামাআতী দুআ করা।

দাফন করার সময় যিক্র জোরে-শোরে পড়া। মাথার দিক থেকে লাশ নামানো। মুর্দার জন্য কবরে বালিশ তৈরী করা। কবরকে সুগন্ধিত করা। মাটি দেবার সম 'মিনহা খালাকনাকুম' আয়াত পড়া। (কবরে যে লাশ রাখে সে ছাড়া) সকলের 'বিসমিল্লাহি অআলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ' দুআ পড়া। লাশের বুকে মাটি রাখা। কবর এক বিদ্যার অধিক উঁচু করা। কবরের চার কোণে ও মাঝে খেজুর ডাল গাড়া। (অবশ্য পশুর নষ্ট করা থেকে বাঁচাতে কাঁটা ইত্যাদি রাখা দূষণীয় নয়।) কবর লোয়ানো। (অবশ্য 'লহদ' কবরে শুষ্ক মাটিকে ভিজিয়ে বসানোর জন্য পানি ঢালা উত্তম।) এই সময় সকলের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া। দাফন শেষে হাত তুলে দুআ-দরূদ পড়া। মাথার দিকে সূরা ফাতিহা বা সূরা বাক্বারার প্রথমাংশ এবং পায়ের দিকে সূরা বাক্বারার শেষাংশ পাঠ করা। দাফনের পর 'তালক্বীন' দেওয়া। কবরের পাশেই মাটির পাত্র (ব্যবহার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও) ছেড়ে আসা। বিশ্বাস রাখা যে, কবরের মাটি বাড়লে হালে আবার কেউ মরবে!

দাফনের পর কবরের পাশে বাস করা ও (পাহারা দেওয়া। অবশ্য লাশের কোন অঙ্গ অথবা কাফন চুরি হওয়ার আশঙ্কায় পাহারা দিলে ভিন্ন কথা।) আমাবশ্যার রাতে মরা খারাপ বা অশুভ মনে করা। দাফন করা থেকে ফিরে এসে হাত-মুখ না ধুয়ে বাড়ি প্রবেশ করতে বা কাউকে স্পর্শ করতে নেই ভাবা। কবরের পাশে কোন খাদ্য বিতরণ বা পশু যবেহ। মরা ঘরের যিয়াফত গ্রহণ করা। মরা ঘরে ভোজ করা। (আত্মীয় বা প্রতিবেশীর কেউ না খাওয়ালে সাধারণভাবে দূরের কুটুমদেরকে খাওয়ানো দোষের নয়)। মরা ঘরের আত্মীয়-স্বজনকে দেখা করার জন্য এবং সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে তাদের গৃহে জমায়েত হওয়া ও তার জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করা।

কেবল শোকপালনের উদ্দেশ্যে দাড়ি-গোঁফ লম্বা করা। অভ্যাসমত ভালো খাওয়া ত্যাগ করা। (মৃতব্যক্তির স্ত্রী ব্যতীত) অন্য কারো শোক পালনের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য ত্যাগ করা। বিধবার মৃত্যু অবধি সৌন্দর্য ত্যাগ করা। (গায়র মাহরামের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশ হারাম)। পুনঃ বিবাহ করাকে মন্দ ও দূষণীয় জানা। (অথচ মন্দের

পথে পা বাড়াতে এবং ব্যভিচার করতে ভয় করে না!)

মৃতের নামে কুরআনখানী, ফাতেহাখানি ও চল্লিশে (চালশে) করা। মুর্দার দম যাওয়ার স্থানে কয়েক দিন ধরে লাতা দেওয়া, বাতি ও ধূপ জ্বালিয়ে রাখা। এই বিশ্বাস যে বাড়িতে রূহ আসে। মৃত যা খেতে ভালোবাসতো তাই সদকাহ করা। মৃতের ব্যবহৃত পোশাকাদি সদকাহ করা। কারো মরার পূর্বেই কবর খনন করে রাখা। দাফনের পর কয়েকদিন সকালে কবর যিয়ারত করা। যিয়ারতের জন্য কোন দিন নির্ধারিত করা, কারো কবর যিয়ারতে তাবার্রুক বা নেকীর আশা করা। কবরের সামনে মুসল্লীর মত খাড়া হওয়া। কোন যিয়ারতকারীর মাধ্যমে সালাম পাঠানো। নামায ও তেলাঅত দ্বারা ঈসালে সওয়াব করা। ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন অনুষ্ঠান করা। সালেহীনদের কবরের নিকট দুআ কবুল হয় এই বিশ্বাস রাখা এবং এই উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা। কবরস্থানের গাছ-পালাকে পবিত্র মানা এবং তা কাটতে নেই মনে করা বা কাটতে ভয় করা। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর থেকে সফর করা। তাতে এত এত নেকী আছে মনে করা।

কবর বাঁধানো, শিয়রদেশে পাথরের উপর নাম খোদাই করা, কোন আয়াত লিখা বা 'জান্নাতী' লিখা। কবরের উপর দর্গা, মাযার ও বাগান তৈরী করা, মসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ করা, বাতি জ্বালানো, ধূপ-ধুনা দেওয়া। মাটির হাতি-ঘোড়া পেশ করা, নযর নিয়ায পেশ করা, পশু যবেহ করা। কবরকে সিজদাহ করা, তার তওয়াফ করা, সম্মুখ করে কবরবাসীর ধ্যান করা, কবরের নিকট বসে বা স্পর্শ করে তাবার্রুক নেওয়া। কবর বা মাযার চুম্বন বা স্পর্শ করে গায়ে মাখা। কবরের দেওয়ালে বা মাযারে কপাল, গাল পিঠ বা পেট লাগিয়ে দুআ করা। সন্তান লাভের আশায় যোনি দ্বারা স্পর্শ করা! তাযীম করে কবরের দিকে পিঠ না করা। কবরের প্রতি সম্মুখ করে নামায পড়া। কবরবাসীকে নাজাতের অসীলা বা বিপদে সুপারিশকারী মানা, তার অসীলায় দুআ করা। তার নামে আল্লাহর উপর কসম খাওয়া। তার নিকট সাহায্য, সন্তান, সম্পদ, সুখ ও বিপদ মুক্তি চাওয়া। কবরের পাশে ধ্যান ও যিক্র করা। কবর যিয়ারতের পর উল্টাপায়ে ও কবরকে সামনে করেই ফিরে আসা। মসজিদে কারো কবর দেওয়া। কবরের উপর উরস, মেলা প্রভৃতি পাপের মিলনক্ষেত্র অনুষ্ঠান করা, চাদর চড়ানো।

মদীনা বিষয়ক বিদআত

মদীনাবাসীর মসজিদে নববী প্রবেশ কালে প্রত্যেকবার নবীর কবর যিয়ারত করা। তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা সফর করা। নামাযীর মত বিনয় সহকারে কবরের প্রতি মুখ করে খাড়া হয়ে দরূদ ও দুআ পাঠ করা। তাঁর নিকট গোনাহর ইস্তিগফার চাওয়া। [3] তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া, তাঁকে অসীলা মানা, তাঁর নাম নিয়ে আল্লাহর উপর কসম খাওয়া, তাঁর নিকট শাফাআত চাওয়া। প্রয়োজন লিখে হুজরার বা তাঁর ধারে-পাশে নিক্ষেপ করা। তাঁর বা অন্য কারো কবরের উপর আতর ছড়ানো। হাজীদের সাথে সালাম পাঠানো, চিরকুট ও আতর পাঠানো। তাহিয়্যাতুল মসজিদ না পড়ে কবর যিয়ারত। লম্বা সময় ধরে হুজরার প্রতি মুখ করে নিজের জন্য দুআ করা। কারো মৃত্যু দিবস পালন করা। নবী ﷺ যিয়ারতকারীর সব প্রয়োজন জানেন মনে করা। তাঁর কবরকে সামনে করে ইচ্ছাকৃত নামায পড়া বা যিক্র করা।

মদীনার যিয়ারতে মসজিদে নববী ও মসজিদে কুবা ছাড়া অন্যান্য মসজিদ সওয়াবের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা। মসজিদে নববীর মেহরাব, মিম্বার, হুজরার রেলিং ইত্যাদি স্পর্শ করে তাবার্রুক গ্রহণ। মদীনায় যিয়ারতে মসজিদে নববীতে চল্লিস ওয়াক্ত নামায পড়তেই হয় মনে করা। সবুজ গম্বুজ থেকে গড়িয়ে পড়া পানি দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ করা। প্রথম কাতার ছেড়ে আসল মসজিদে নামায। প্রত্যহ বাকী'র কবরস্থান যিয়ারত। মসজিদ থেকে উল্টা পায়ে বের হওয়া। নবী ﷺ-এর সমাধিক্ষেত্রকে আল্লাহর আরশ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাপূর্ণ মনে করা!

বিবাহ বিষয়ক বিদআত

বিবাহে প্রচলিত কুপ্রথা ও বিদআত যেমন, কন্যাপক্ষের নিকট হতে বরপক্ষের সেলামী, ঘুষ বা পণ গ্রহণ। কোর্টশিপ (ইউরোপীয় প্রথায় বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে হৃদয়ের আদান প্রদান)। বর, (মাহরাম অথবা কোন মহিলা) ছাড়া অন্য কারো বউ দেখা। বর কর্তৃক কনেকে পয়গামের অঙ্গুরী পরানো এবং ভবিষ্যতে তা তাদের দাম্পত্য-সুখের কারণ ভাবা ও খুলে ফেললে অমঙ্গলের আশঙ্কা করা, কোন নির্দিষ্ট

([3]) আল্লাহ তাআলা বলেন, "যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে, তখন যদি তারা তোমার (নবীর) নিকট আসত ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত, তবে নিশ্চয় তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পেত।" (সূরা নিসা ৬৪ আয়াত) এই ইস্তিগফার তাঁর পার্থিব জীবনে জীবিতাবস্থার কথা। তাঁর মৃত্যুর পর এরূপ আশা নিছক ভুল ও বিদআত। সুতরাং তাঁর কবর যিয়ারত করলেই কারো পাপ ক্ষয় হয় না।

দিনে বা মাসে বিয়ে শুভ বা অশুভ মনে করা। বিয়ের কথা (সম্বন্ধ) চলাকালীন কনে ডিম ভাঙ্গলে বিয়ে যাবে ভাবা। লগন ধরানো, গায়ে হলুদ। (অবশ্য এই সময়ে দেহের রঙ্গ উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যে গায়ে হলুদ মাখলে ভিন্ন কথা।) হাতে সুতো রাখা। সাথে যাঁতি, কাজললতা বা কোন লোহা রাখা। কনের মাথায় শিবতেল ঢালা। ঢিকি মঙ্গলা। আলমতলায় লাতা ও সিন্দুর দেওয়া। বর-কনেকে আইবুড়ো বা থুবড়ো ভাত খাওয়ানো। (বিশেষ করে গম্য পুরুষের হাতে গম্যা নারীর এবং গম্যা নারীর হাতে গম্য পুরুষের ভাত ও ক্ষীর খাওয়া অবৈধ।) বরযাত্রী বা কনেযাত্রী দর-কষাকষি করে প্রয়োজনের অধিক গিয়ে অপরপক্ষের অসম্মতি সত্ত্বেও জবরদস্তি তার খেয়ে খরচ বৃদ্ধি করা। ছেলে বিয়ে করতে যাবার সময় গাড়িতে চড়লে পর্দা করে ছেলের পায়ে মায়ের তেল দিয়ে জিজ্ঞাসা করা, 'বাবা! কোথায় চললে?' ছেলে বলে, 'মা! তোমার জন্য দাসী আনতে চললাম।' (এটি খুবই ধ্রুব সত্য কথা। ঘরে ঘরে বধূ নির্যাতনই এর সাক্ষি।) ঐ বিদায়ের সময় মুখে দুধ ভাত দেওয়া।

বর আগমন করে মহল্লার মসজিদে গিয়ে বিশিষ্ট কোন নামায আদায় করা। (অবশ্য বিয়ে মসজিদে পড়ানো হলে মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে ২ রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সকলকেই পড়তে হয়। মসজিদে বেনামাযী, অপবিত্র ও ধূমপায়ী ইত্যাদি বর বা কনেযাত্রী রেখে মসজিদের মান নষ্ট করা কোনক্রমেই বৈধ নয়।) পীর তলায় (!) বরের সালাম করা। আলমতলায় (যেখানে বর-কনেকে বসানো হয় সেখানে) ঝুকে মাটি বা বিছানা ছুঁয়ে সালাম করা। দর্শককে বা উপস্থিত মজলিসকে ঐরূপ সালাম করা। (আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম করাই সুন্নত। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশা ও গান-বাজনার কথা তো বলাই বাহুল্য। যাতে মুসলিম রুচিশীল গৃহকর্তার লজ্জা ও আল্লাহ-ভীতি হওয়া উচিত।) পান-ভোজনে অপচয় করা।

নামমাত্র মোহর বাঁধা ও আদায় না করা বা করার নিয়ত না রাখা। বিজোড় টাকার দেনমোহর বাঁধা। দেনমোহরের কিছু টাকা বাকি রাখতে হয়, (আর পণের টাকা কড়ায় কড়ায় আদায় করে দিতে হয়) মনে করা। দেনমোহরের গয়না ও কাপড়াদি কাঁসের থালায় আনা। বিয়ে পড়ানোর সময় ঐ থালায় দেন মোহরের জেওরাদির সাথে পান-সুপারি রাখা। বরকে কেবলা মুখে বসানো। কনের নিকট ইয্‌ন বা বিবাহের অনুমতি নেওয়ার অনুষ্ঠান এবং অলী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অন্য কারো ইয্‌ন তলব। এই অনুষ্ঠানে কনেকে উল্টো করে সায়া-ব্লাউজ পরানো। বর্তমান প্রচলিত

উকিল-সাক্ষী বানানোর প্রথা। (অথচ পাত্রীর মৌখিক অনুমতির উপর কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। এর জন্য তার তরফ থেকে (অনুমতি পেয়ে) অভিভাবকের অনুমতিই যথেষ্ট। বরের স্বীকারোক্তির সময় কমপক্ষে দুই জন পুরুষ সাক্ষী জরুরী।) আক্‌দের শেষে সকলের হাত তুলে জামাআতী দুআ। বরকে অর্ধ গ্লাস শরবত ও অর্ধ পান খেতে দেওয়া এবং অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অর্ধ শরবত ও পান কনেকে খেতে দেওয়া। জামাই দেখতে নানা মাতামাতি ও 'চিনি' খেলা। বর-কনে একত্রিত করে সকলের সামনে গাঁটছড়া বাঁধা প্রভৃতি বিভিন্ন কীর্তি। বিয়ে বিদায় না হওয়া পর্যন্ত ঝাঁড়ু না দেওয়া। বধু বরণের সময় তেল-ফুল বা মিষ্টি ব্যবহার। নববধুকে প্রথম দিনেই শ্বশুর বাড়িতে খেতে নেই মনে করা। বাসর ঘরে একই প্লেটে স্বামী-স্ত্রী ভাত খেতে স্ত্রীর প্লেট ধরে থাকা। বধুর বিদায়কালে বড়দের পা ছুয়ে সালাম এবং মিষ্টান্ন বিতরণ। দুধ ইত্যাদি দিয়ে বাসর ঠান্ডা। বিবাহের পর 'হানিমুন' ও বিবাহ বার্ষিকী পালন।

তালাকের বিদআত যেমন, স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় তালাক, যে পবিত্রতায় সহবাস করা হয়েছে সেই পবিত্রতায় তালাক। তালাকের উপর কসম খাওয়া। এক মজলিসে তিন তালাক।

শিশু বিষয়ক বিদআত

শিশুর জন্ম সংক্রান্ত প্রচলিত বিদআত যেমন, গর্ভিনীকে সাত-ভাত ও পাঁচভাজা খাওয়ানোর অনুষ্ঠান। ভ্রূণ নষ্ট হওয়ার ভয়ে বিভিন্ন তাবীয-নোয়া বাঁধা। কোন শরয়ী বা বৈজ্ঞানিক হেতু বিনা অন্য কোন হেতু বা কারণে সন্তান অন্ধ বা বিকলাঙ্গ হবে ভাবা। প্রসব হতে কষ্ট হলে প্রসূতির জাঙ্গে কুরআনী (!) বা অন্য তাবীয বাঁধা। প্রসব হওয়ার সময় প্রসূতিগৃহে ছেঁড়া জাল, মুড়ো ঝাঁটা, লোহা ইত্যাদি রাখা। দু কুড়ি দিন বা চল্লিশ দিনের পবিত্রতা অনুষ্ঠান। (যদিও প্রসূতি পূর্বেই পবিত্রা হয়ে গেছে অথবা পরে হবে।) খতনার সময় (মুসলমানিতে) বিভিন্ন আড়ম্বর ও ক্ষীর খাওয়ানোর ঘটা। নবজাত শিশুকে চল্লিশ দিন অতিবাহিত না হওয়ার পূর্বে ঘর হতে বের করতে নেই মনে করা। নযর লাগার ভয়ে শিশুর কপালের পাশে বা গালে কালির ফোঁটা দেওয়া বা আঙ্গুল কামড়ানো। কুলোতে বসে বাচ্চা ছিঁকলে অসুখ ছাড়ে না ভাবা। কন্যা শিশুর জন্মক্ষণে তার কানে (আযানের পরিবর্তে) বাটি বাজানো।

লিঙ্গত্বকহীনভাবে কারো জন্ম হলে ফিরিশ্তা খতনা করেছে ভাবা এবং পরে পান

কাটা ও লিঙ্গের উপর খুর ফিরানো। শিশুর জন্ম বার্ষিকী বা 'হ্যাপি বার্থডে' পালন।

ঈদ ও পরব বিষয়ক বিদআত

প্রচলিত পাল-পার্বনের বিদআত যেমন, নবী দিবস, ফাতেহা ইয়াযদহম, দোয়াযদহম, আখেরী চাহার শোম্বা, শবে মি'রাজ, জুমআতুল বিদআহ, শবেবরাত, তার নামায-রোযা ও দীপাবলীসহ বিভিন্ন ঘটা। মহর্রম ও তার তা'যিয়া, নিশানা, মর্সিয়া, বাদ্য ও আত্মপ্রহার দ্বারা শোকপালন এবং অন্যান্য সমারোহ। [4] মহর্রমের চালশে করা। নবান্ন (!) এবং পৌষপার্বন (!) পালন।

ঈদের বিদআত যেমন, সমস্বরে ঈদের তকবীর পাঠ। অবৈধ জিনিস দ্বারা সাজ-সজ্জা এবং অবৈধ খেল-তামাশা দ্বারা খুশী করা। ঈদের নামায পড়ে কবর যিয়ারত।

ভোজের দাওয়াতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে খরচে অতিরঞ্জন করা। দরিদ্র ছেড়ে কেবল ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া। নতুন গৃহ নির্মাণের পর উদ্বোধন করা বা জিন-ভূত বিতাড়ণের উদ্দেশ্যে মীলাদ পড়ানো। (অবশ্য নতুন ঘরের খুশীতে পান-ভোজন করানো দূষণীয় নয়।) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনে ফিতা কাটা প্রভৃতি অনুষ্ঠান।

বিবিধ বিদআত

খাবার সময় ডান গালে, বাম গালে এবং গিলে নেওয়ার পর নির্দিষ্ট যিক্র বা দুআ, খেতে খেতে বিভিন্ন যিক্র। ওষুধ খাওয়ার আগে 'আল্লাহু শাফী--' বলা।

কোন মসীবত বা পরাজয়ের সময় কালো কাপড় পরিধান করে বা কালো নিশানা

([4]) এ সবের মধ্যে মাতম করা জাহেলিয়াতের কুপ্রথা। প্রকাশ থাকে যে, আশূরার দিনে হযরত হুসাইন (রাঃ) শহীদ হয়েছেন বলে রোযা রাখা হয় না। বরং ঐ দিনে এবং ওর আগে আর একদিন রোযা রাখা রসূল ﷺ-এর সুন্নত ও নির্দেশ। হযরত হুসাইন ؓ-এর জন্য ঐ দিনে অথবা আর কারো জন্য কোন দিনে শোক বা মৃত্যুদিবস পালন করা বিদআত। আশূরার দিনকে শোকপালনের দিনরূপে গ্রহণ করে শিয়ারা এবং ঐ দিনকে ঈদ বা খুশীর দিনরূপে গ্রহণ করে নাসেবীরা (যারা হযরত আলী ؓ ও তাঁর বংশধরের প্রতি বিদ্বেষ রাখে।) সুন্নী বা আহলে সুন্নাহর নিকট ঐ দিন কেবল নবী ﷺ-এর সুন্নাহর অনুকরণে রোযা পালনের দিন।

উড়িয়ে শোক পালন। বদনযর দূর করতে তাবীয, নোয়া, সুতো, ছেঁড়া জাল বা জুতো, মুড়ো ঝাঁটা, ভাঙ্গা হাঁড়ি প্রভৃতি ব্যবহার। এই উদ্দেশ্যে শিশুর পাশ কপালে বা গালে কালো ফোটা দেওয়া। গাছে ভাঙ্গা হাঁড়ি ও গাড়িতে ছেঁড়া জুতো বাঁধা। ফসল-ক্ষেতে মানুষের আকারে কোন মূর্তি গাড়া।[5] তাবীয-গন্ডা, লোহা ও তামার তার, শঙ্খ ও জীবশাঁখ প্রভৃতি আরোগ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার। কোন পাখীর হাড়, পালক, কোন পশুর চুল প্রভৃতির তাবীয বাঁধা। খাওয়ার সময় কেউ দেখলে পেটে লাগা বা নযর লাগার ভয়ে কিছু খাবার মাটিতে ফেলা।

কোন ব্যক্তি, ঐতিহাসিক স্থান কবর ইত্যাদি দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ। পীর বা মাযারের নামে পশু উৎসর্গ করা। গায়রুল্লাহর নামে গরু, খাসি প্রভৃতি ছাড়া বা মানত করা। সংসারত্যাগী বা বৈরাগী হওয়া। কাম দমনের উদ্দেশ্যে খাসি করা। দেহ পীড়নের সাথে কোন ইবাদত করা। (আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে) কোন হালাল বস্তুকে হারাম করা। শরীয়তকে জ্ঞানের নিক্তিতে ওজন করা। দ্বীনে বিভিন্ন দল সৃষ্টি করা। তাসাউবুফ বা রাজনীতি দ্বারা ইসলামী দাওয়াত শুরু করা।[6] অভিনয়, উপন্যাস-উপাখ্যান, গজল-গীতি, বায়াত ইত্যাদিকে দাওয়াতের অসীলা মানা। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন শাসক, বিধানদাতা, প্রভু বা কর্তা নেই' করা।[7]

ধর্মীয় প্রশ্নে বিদআত যেমন, আল্লাহ আরশে কিভাবে আসীন আছেন? আল্লাহর অবয়ব আছে কি না? তাঁর হাত-পা কেমন? আকাশে নেমে এলে আরশ খালি হয় কিনা? ইত্যাদি।

অমূলক বিশ্বাস বিষয়ক বিদআত

অমূলক বিশ্বাস ও কুধারণার বিদআত যেমন, কোন বিশিষ্ট (যা শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত নয় এমন) মাস, দিন, ক্ষণ বা স্থানে অযথা শুভাশুভ আশা ও ধারণা রাখা। যেমন, অমাবশ্যায় অমুক হয়, রবিবারে বাঁশ কাটতে নেই জ্বর হয়। বৃহস্পতিবার

---

(5) প্রকাশ যে মূর্তি গাড়া হারাম। তা যদি ক্ষেতে পাখী বিতাড়নের উদ্দেশ্যে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তা ফলপ্রসূ ও জরুরী হয় তবে মস্তক না গড়া উচিত।

(6) যেহেতু সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু সালামগণের সুন্নত তওহীদ দ্বারা দ্বীনের দাওয়াত ও তবলীগ শুরু করা। আর তওহীদ ইসলামী দাওয়াতের মূল বুনিয়াদ।

(7) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সঠিক অর্থ হল, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সত্যিকার মাবুদ বা উপাস্য নেই।

অমুক করতে হয় বা তার বিকাল ও সন্ধ্যা অশুভ। অমুক মাসে বিয়ে নেই। মলমাসে কোন শুভ কাজ নেই। অমুক দিনে যাত্রা নেই ইত্যাদি মনে করা।

অমুকের মুখ, খালি কলসী, কালি হাঁড়ি বা অন্য কিছু দেখে, কারো নাম, কাক, কুকুর বা অন্য প্রাণীর ডাক শুনে অমঙ্গলের আশঙ্কা করা। পিছু ডাকলে, ডাইনের শিয়াল বাঁয়ে গেলে যাত্রা অশুভ হয় অথবা কাজ সফল হয় না মনে করা। অমুক জিনিস রাত্রে বা সকালে বের করতে বা দিতে বা বেচতে নেই ইত্যাদি ভাবা। কোন রাশিচক্রকে মঙ্গলামঙ্গল বা বৃষ্টি-অনাবৃষ্টির কারণ ভাবা।

আরো হাস্যকর অসার (মেয়েলি) বিশ্বাস যেমন, কাস্তে দ্বারা মাটিতে আঁক দিলে দেনা হয়। শিশুর কান মললে তার হায়াত কমে যায়। শরকাঠি বা বাম হাত দ্বারা আঘাত করলে (আঘাত প্রাপ্ত শিশু) কৃশ হয়ে (শুকিয়ে) যায়। কোমরে পা ঠেকলে ব্যথা হয়। বালিশে পা পড়লে ঘাড়ে ব্যথা হয়। শাক ডিঙ্গালে জিভে ব্যথা হয়। ঘরে ভাঙ্গা আয়না রাখলে গরীব হতে হয়।

নাপাক অবস্থায় গাছে হাত দিলে গাছ মারা যায়। মুখে মিষ্টি নিয়ে কোন ফলগাছ লাগালে তার ফল তিক্ত হয় না। খেল (কাদা মাখামাখি) খেললে, আখের বোঝার উপর বসলে বা ব্যাঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হয়। বাম চোখ লাফালে নোকসান ও ডান চোখ লাফালে লাভ হয়। বামের শিয়াল ডাইনে গেলে অথবা তার বিপরীত গেলে লাভ অথবা নোকসান হয়। গলায় খাদ্য বা পানীয় লাগলে কোন আত্মীয় স্মরণ করে। প্রথম ডিমে নোড়া বুলালে মুরগী নোড়ার মত বড় বড় ডিম দেয়। চালুন বুলালে তার ছিদ্র সমান অসংখ্য ডিম পাড়ে। শিশুর ভাঙ্গা দাঁত পানিতে ফেললে অথবা ইঁদুরের গর্তে দিলে মাছ বা ইঁদুরের মত সরু সরু দাঁত হয়! ভালুকের লোম ব্যবহার করলে জ্বর যায়। যাত্রা পথে বাড়ি থেকে বের হতে কেউ পিছু ডাকলে যাত্রা শুভ হয় না বা কাজ সিদ্ধ হয় না ইত্যাদি অযৌক্তিক বিশ্বাস।

নতুন গরু মহিষ ক্রয় করলে তার পা ধুয়ে তেল (!) দেওয়া। গরুর পায়ে ঝাঁটা ঠেকাতে নেই মনে করা। গরু মারা গেলে তার মুখে দূর্বাঘাস রাখা। গাভিন গায়ের গলায় আমড়ার আঁটি, চাবিকাঠি, কড়ি, চামড়া ইত্যাদি বাঁধা। সদ্যজাত বাছুরের গলায় লাতাকানি বাঁধা, গরু পরবের (?) দিন গরু-ছাগলের গায়ে রঙ্গিন ছাপ দেওয়া।

কাপড় নিচোড়া পানি পায়ে নিলে অসুখ ছাড়ে না, তালপাতার পাখা ঘুরানোর সময় কারো গায়ে লাগলে অসুখ হয়। (তার জন্য মাটিয়ে ঠেকাতে হয়।) কশে ঘা (শালকী) হলে শালিক পাখির পায়ের ধুলোয় ভাল হয়। মাথায় মাথায় ঠোকা গেলে এবং

দ্বিতীয়বার না ঠুকলে শিং গজায়! দুই হাঁটু গেড়ে ভাত খেলে মা-বাপের মাথা খাওয়া হয়, আমানিতে হাত ধুলে মরার সময় ছেলে নিজ মা-বাপের মুখ দেখতে পায় না। কোন কথা চালাকালীন কেউ হাঁচলে অথবা টিকটিকি আওয়াজ দিলে কথার সত্যায়ন হয়। দুই মুরগী মুখোমুখী হলে, হাত হতে (চিরুনী, বাটি বা অন্য) কিছু পড়লে অথবা গৃহের ছাদে বা চালে কাকে আদার খাওয়ালে বাড়িতে কুটুম আসে।

পায়ে মইদি মাখতে নেই (কারণ নবী সাহেব দাঁড়িতে লাগিয়েছিলেন তাই!) শাহাদৎ আঙ্গুলে চুন লাগাতে নেই, রাতে নখ কাটতে নেই, চুল আচঁড়াতে নেই, আয়না দেখতে নেই। রাতের বেলায় চাল চিবিয়ে খেতে নেই, রাতে আঙ্গুল ফোটাতে নেই। সন্ধ্যাবেলায় ভাত খেতে নেই। (কারণ সে সময় মওতারা খায়।) ভাদ্র মাসে ঝাঁটা কিনতে নেই, গোয়ালে মাটি দিতে নেই। অগ্রহায়ন মাসে কুকুর-বিড়ালকে ছি করতে নেই। ঝুড়ি-ঝাঁটা বাইরে রাখতে নেই। ধানের ধুলো ঝাড়তে নেই। (আহা ধানের ধুলো পায় কে?) খাবার জিনিস ঝাঁটা করে ঝাড়তে নেই। (যেহেতু মা লক্ষ্মীকে ঝাঁটা মারা হয় তাই!) পরীক্ষা দিতে যাবার আগে ডিম খেতে নেই। (খেয়ে পরীক্ষা দিলে ডিমের মত নম্বর অর্থাৎ জিরো পাবে।)

পিঁয়াজ রসূনের ছাল না পোড়ানো। ধানের রাস ও পাটার উপর খড়ের আঁটি রাখা। গোলার নীচে ঘুঁটে রাখা। মাপার শেষে কিছু চাল ফিরিয়ে নিয়ে বর্কতের আশা। মাপার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বা এক বলার পরিবর্তে বর্কত বলা। কসাইদের গোশ্তে গোশ্ত্ মেরে বর্কতের আশা। ধান-চাল পাছুরতে কুলো খালি না করা। ঘরের মুদুনী তুলতে সিন্দুর ব্যবহার। ছেলে ঘুমাবার সময় কাউকে কোদাল দিলে তাতে পানি দিয়ে দেওয়া। ছেলে কোলে থাকলে কোদাল কুড়ুল হাতে বহন না করা।

অন্ধকারে বসে বা দাঁড়িয়ে অথবা হাঁটতে হাঁটতে কিছু খেলে বা পান করলে, মৃতব্যক্তির পাশে আহার করলে, ভাঙ্গা পাত্রে আহার করলে, পরিহিত কাপড়ে হাত মুছলে, পরিহিত কাপড় সিলাই করলে, ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখলে, ঝাড়ু দিয়ে ঘরের মধ্যে ময়লা জমা রাখলে, খাওয়া শেষে হাঁড়িকুড়ি না ধুয়ে রাখলে, ওযু করার সময় অহেতুক কথা বললে, হেঁটে হেঁটে দাঁতন করলে, তেলাঅতের সিজদায় দেরী করলে, ময়লা কাপড় বা ছেঁড়া জুতা-খরম ব্যবহার করলে, গুপ্তস্থানের লোম ৪০ দিনের বেশী ছেড়ে রাখলে অথবা তা কাঁচি দ্বারা পরিষ্কার করলে, পানিতে প্রস্রাব করলে, উলঙ্গ হয়ে গোসল করলে, জানাযার আগে আগে হাঁটলে, বিনা ওযূতে হাঁটতে হাঁটতে দরূদ শরীফ পড়লে পরিবারে ও জীবনে অশান্তি নেমে আসে ধারণা করা।

দাঁত দিয়ে নখ কাটলে, রাত্রিকালে একাকী ভ্রমণ করলে, বাম হাতে কোন জিনিস আদান-প্রদান করলে হৃদয় পাষাণ হয়ে যায় ধারণা রাখা।

হেলান দিয়ে আহার করলে, ঘাড়ের পশম কামিয়ে ফেললে, উকুন পেয়ে জীবিত ছেড়ে দিলে স্মৃতিশক্তি লোপ পায় মনে করা।

উক্ত প্রকার বিশ্বাসগত অমূলক মেয়েলী বিদআত যা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এবং যার বেশীর ভাগ 'বুড়ি'দের নিকট হতে 'হিফয' ও রেওয়ায়াত করা হয়ে থাকে।

পরিশেষে

বিদআত রুখব কিভাবে?

(১) যথাসম্ভব অধিকাধিক সুন্নাহ জানা ও প্রচার করার মাধ্যমে বিদআতের মুকাবিলা করতে পারা যায়।

(২) বিদআত রুখার জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের এবং বিশেষ করে শিক্ষিতদের নির্দিষ্ট কর্তব্য রয়েছে। তন্মধ্যে উলামাদের কর্তব্য ও ভূমিকা সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সকল রকম বাধা ও স্বার্থকে উল্লংঘন করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সহীহ সুন্নাহকে বাস্তবায়ন করে, তার প্রত্যেকটি নির্দেশের উপর আমল করে নিজেদের জীবন ও সমাজ গড়ে তুলে আমরা বিদআতকে প্রতিহত করতে পারি।

(৩) বিদআত সৃষ্টির যে সমস্ত মূল কারণ রয়েছে তা ধ্বংস ও নির্মূল করে বিদআতের প্রাদুর্ভাব থেকে আমরা বাঁচতে পারি।

(৪) যে আলেম ইজতিহাদের উপযুক্ত নয় তাঁর নিকট হতে কোন ইজতিহাদী মত গ্রহণ করব না এবং অন্ধভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের খাতিরে তাঁর ইজতিহাদ মতে আমল করব না।

(৫) উদার ও খোলা মনে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অস্ত্র দ্বারা প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কারের শরয়ী অপারেশন করব এবং এ ব্যাপারে মজবুত অস্ত্র কেবল কুরআন, সহীহ বা হাসান হাদীস এবং সহীহভাবে প্রমাণিত সাহাবাদের আদর্শকেই মানব। আর 'ফাযায়েলে আ'মালে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার চলবে' এই তর্ক করে যয়ীফ, যয়ীফ জিদ্দা ও মওযু' হাদীসের উপর আমল করব না।

(৬) আমরা কোন মতবাদীর ব্যক্তি পূজা করে অথবা কোন দলীয় নীতির ভক্তি পূজা করে তার কোন রায়, ইজতেহাদ ও মতবাদের অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করব না। আমাদের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য হবে 'হক' ন্যায় ও প্রকৃত সত্যের নাগাল। যার অসীলা হবে শুদ্ধ প্রতিপাদিত ও যুক্তিযুক্ত দলীল।

(৭) কাজ যত ছোটই হোক, তাতে আমরা সুন্নাহর সীমালংঘন করব না।

(৮) সাধারণ 'শুন-মৌলভী' আলেম ও ওস্তাদীদেরকে ফতোয়া দেওয়া হতে রুখব এবং আমরা তাদেরকে কোন ফতোয়া জিজ্ঞাসা করব না, যারা ফতোয়া দেওয়ার উপযুক্ত নয়, তাদের ফতোয়া মানবও না; যদি জানি যে, প্রকৃত মুফতীগণের ফতোয়া এর পরিপন্থী।

(৯) আমরা কোন বিশ্বাস বা কর্মগত বিষয়ে কোন বিধর্মীর অনুকরণ করব না। মুসলিমদের প্রতি অমুসলিমদের বিশ্বাস ও প্রথার অনুপ্রবেশ-পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করব।

(১০) দ্বীনী বিষয়ে আমরা জ্ঞানকে প্রাধান্য দেব না, বরং জ্ঞান ও সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা সর্বজ্ঞ আল্লাহর হিকমত ও যুক্তিকে প্রাধান্য দেব; যদিও আমাদের নিকট তা বোধগম্য নয়। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, আল-বিদআহ, তাহদীদুহা অমাওক্বিফুল ইসলামি মিনহা ৪৯৩-৪৯৮পৃঃ)*

এ সব কিছু যদি আমরা করতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ দেখব যে, বিদআত ও বিদআতী এ ধরা থেকে চিরতরের জন্য বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাই করার তওফীক ও প্রেরণা দিন। আমীন।

অস্বাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ, অআলা আলিহী অসাহবিহী আজমাঈন।